the ethics of medical practice; the description also of lithotomy in the former agrees almost exactly with Alexandrian practice as given by Celsns. But there are certainly some dexterous operations described in Susruta (such as the rhinoplastic) which were of native invention, the elaborate and lofty ethical code appears to be of pure Brahmanical origin; and the very copious materia medica (which included arsenic, mercury, zinc and many other substances of permanent value) does contain a single article of foreign source. There is evidence also (in Arian, strabo and other writers). That the east enjoyed a proverbial reputation for medical and surgical wisdom at the time of Alexander's invasion. We may give the first place, then, to the Eastern branch of Aryan race in a sketch of the rise of surgery.

অনুবাদ:—আর্য্যজাতির প্রাচ্য প্রাতীচ্য উভয় শাখাই বহুকাল পূর্ব্বে শস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। গ্রীকেরা ইজিপ্ট দেশের পুরোহিত গণের সাহায্যে হিন্দুদিগের নিকট হইতে তাহাদের চিকিৎসা-বিদ্যা অথবা তাহার কিয়দংশ শিক্ষা করিয়াছিল কিম্বা হিন্দুরা তাহাদের বহুপ্রাচীন যজুর্ব্বেদমূলক চরক ও সুশ্রুত লিখিত উন্নত কায়চিকিৎসা ও শস্ত্র চিকিৎসা আলেক্জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে আসিয়া শিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। প্রথমোক্ত ব্যাপারের সত্যতা ডাক্তার ওয়াইজ তাঁহার "এশিয়াবাসির চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস" নামক পুস্তকের ভূমিকায় যুক্তিযুক্তরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। সুশ্রুত লিখিত চিকিৎসা-সূত্রের সহিত হিপোক্রাট কর্ত্তৃক সংগৃহীত চিকিৎসা শাস্ত্রগুলির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অশ্মরী রোগে শস্ত্রপ্রয়োগ সম্বন্ধে সুশ্রুতে যেরূপ উপদেশ আছে, আলেকজান্দ্রা নগরের চিকিৎসক সেলসস্ কর্ত্তৃক লিখিত চিকিৎসা তাহার অনুরূপ কিন্তু সুশ্রুতের লিখিত কতকগুলি সুন্দর শস্ত্রচিকিৎসা (যেমন ছিন্ননাসিকার চিকিৎসা) নিশ্চয়ই তদ্দেশীয় আবিষ্কার। চিকিৎসা নীতি সম্বন্ধে যে সুন্দর এবং উন্নত উপদেশ আছে তাহা বৈদিককালে লিখিত। বহু বিস্তৃত ভেষজ-সংগ্রহ, যাহাতে আর্সেনিক, পারদ, দস্তা এবং তদ্রূপ অনেক দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে একটীও বিদেশীয় বস্তু দেখা যায় না। এরিয়ান্ ষ্ট্রাবো এবং অন্যান্য লেখকগণের লিখিত প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে তত্রত্য কায়-চিকিৎসা ও শস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রবাদবাক্য রূপে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং আর্য্যজাতির প্রতীচ্য শাখাকেই শস্ত্রচিকিৎসার উন্নতি সাধন বিষয়ে প্রথম স্থান দিতে পারি।

এক্ষণে কায়তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের মধ্যে কায়তন্ত্রানুযায়ী চিকিৎসাই এক্ষণে সমধিক প্রচলিত। কায়তন্ত্র প্রসঙ্গে চরকে লিখিত হইয়াছে:—

"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।"

অনুবাদ:—যাহা ইহাতে আছে তাহা অন্যত্র দেখিতে পাইবে, যাহা ইহাতে নাই তাহা কোথায়ও নাই। মহর্ষির এই মহাবাক্যের সার্থকতা এক্ষণেও আমরা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছি।

কায়তন্ত্র আলোচনা করিতে হইলে চরকই আমাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে চরকসংহিতা কায়তন্ত্রের মূলগ্রন্থ নহে। মহর্ষি আত্রেয় কায়তন্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার শিষ্য অগ্নিবেশকে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেন। সেই উপদেশ লাভ করিয়া অগ্নিবেশ ঋষি কায়তন্ত্র-প্রধান যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেন তাহা অগ্নিবেশসংহিতা নামে খ্যাত হয়। কালে অগ্নিবেশ সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে চরক ঋষি সেই সংহিতার প্রতি সংস্কার করেন এবং তখন হইতে অধুনা পর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থ চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ আছে। পরবর্ত্তী কালে চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে মহামতি দৃঢ়বল তাহার পুনঃ সংস্কার করেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ অঙ্গহানি ঘটায় এবং পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হওয়ায় কায়তন্ত্রের কতদূর অপকর্ষ ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু যতই অপকর্ষ ঘটুক না কেন আমরা চরকসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে জগতে কায়তন্ত্র-প্রধান যত চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, এখনও চরকসংহিতা তাহাদের শীর্ষস্থানীয়।

চরকসংহিতার জনপদধ্বংসনীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সময়ে সময়ে কোন দেশে মহামারী প্রাদুর্ভূত হইলে তত্রত্য অসংখ্য লোক একই প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পৃথিবীর বহুদেশে মধ্যে মধ্যে এইরূপ মহামারী প্রাদুর্ভূত হইয়া অনেক নগর এবং জনপদকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, ইহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। বিদেশীয় অনেক চিকিৎসক স্ব স্ব গ্রন্থে এইরূপ মহামারীর বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন এবং তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু সম্প্রতি ঐ যে ইউরোপ দেশে বিভিন্ন বল দৃপ্ত জাতি ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া অসংখ্য বজ্রনাদী যন্ত্র দ্বারা মুহুর্মুহু অসংখ্য অগ্নিময় লোহ গোলক নিক্ষেপ পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ সৈনিকের ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতেছে, ঐ যে নিহত সৈনিকদিগের বিধবা পত্নী, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও শিশু পুত্রের হাহাকার রবে গগণমণ্ডল পরিপূরিত হইতেছে এই মহা সমরের বিষয়ও সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদকার দিগের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, বহু প্রাচীন যুগে এইরূপ মহাসমর সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, আপনারা তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন :—

তথাশস্ত্রপ্রভবস্যাপি জনপদবিধ্বংসস্য অধর্ম্মহেতু র্ভবতি যেঽতিপ্রবৃদ্ধলোভক্রোধমানা তে দুর্ব্বলানবমত্য আত্ম-স্বজন-পরোপঘাতায় শস্ত্রেণ পরস্পরং অভিক্রামন্তি পরান্ বা অভিক্রামন্তি পরৈর্ব্বা অভিক্রাম্যন্ত ইতি।

এই উক্তির দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে আয়ুর্ব্বেদকারগণ কেবল শরীর সম্বন্ধে নহে, পরন্তু মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ কায়তন্ত্রের পথ্য প্রয়োগ জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখাইতে প্রয়াস পাইব। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

বিনাপি ভৈষজ্যৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি ॥

অনুবাদ :—ঔষধ ব্যতীত কেবল সুপথ্য সেবন দ্বারা রোগ নিবারিত হইতে পারে কিন্তু

সুপথ্য সেবী না হইলে শত ঔষধেও রোগ নিবারিত হয় না।

পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর জ্ঞান বোধ হয় আজিও জগতের অন্য কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। জ্বর রোগে পথ্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং। অর্থাৎ জ্বরের প্রথমে উপবাসই পথ্য। চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন যে প্রবল জ্বরে শরীরের যাবতীয় যন্ত্র, বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্র নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে। যে ক্ষেত্রে পথ্য পরিপাক করিবার সামর্থ্য থাকে না, শরীরে প্রভূত আমরস সঞ্চিত থাকে, সেরূপ ক্ষেত্রে লঙ্ঘনের ন্যায় মহোপকারী পথ্য আর কি হইতে পারে? বিজ্ঞান-গর্ব্বিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রকোবিদগণ আজিও এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রোগীর পরিপাক করিবার শক্তি না থাকিলে, খাদ্য দিলে অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে জ্বরে পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদকারগণ যে উপদেশ দিয়াছেন, অনেক বিজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসক ক্রমে তাহার সারবত্তা বুঝিতে পারিতেছেন।

কিন্তু সাধারণতঃ জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর হইলেও জ্বরবিশেষে পাচকাগ্নি একেবারে দুর্ব্বল হয় না; অপিচ দুর্ব্বল ব্যক্তি, বৃদ্ধ, বালক এবং গর্ভিণী স্ত্রীর লঙ্ঘন দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে। এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন:—

তত্র মারুতক্ষুত্তৃষ্ণা-মুখ-শোষ-ভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে বৃদ্ধে বা ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে॥

অনুবাদ:—বায়ু প্রধান জ্বরে, জ্বররোগীর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখ শোষ বা ভ্রম থাকিলে, জ্বররোগী বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা দুর্ব্বল হইলে একেবারে উপবাস দেওয়া উচিত নয়।

নবজ্বরে লঙ্ঘন অমৃততুল্য হিতকর ভাবিয়া চিকিৎসক পাছে অতিরিক্ত লঙ্ঘন দিয়া রোগীকে মৃত্যু মুখে পাতিত করেন সেই আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন:—

প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠান মারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

অনুবাদ:—বলের বিরোধী বলিয়া রোগীকে অতিরিক্ত লঙ্ঘন দিবে না; কারণ যে আরোগ্যের জন্য চিকিৎসা তাহা বলের উপরেই নির্ভর করে।

পথ্য এরূপ ভাবে দিতে হইবে যেন অস্বাদু না হয় এবং অরুচি না জন্মায়। এসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।
কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ।

অনুবাদ:—সর্ব্বদা একরূপ পথ্য সেবন বা অস্বাদু বলিয়া পথ্যের প্রতি রোগীর বিদ্বেষ হইলে নানা রূপ কল্পনা করিয়া পথ্যকে রোগীর প্রিয় করিবে।

এপর্য্যন্ত বলিয়া শাস্ত্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। বিবিধ কল্পিত পথ্য যদি রোগীর রুচিকর না হয়। তজ্জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন:—

জ্বরিতোঽহিতমশ্নীয়াৎ যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালেহ্যভুঞ্জানো ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽপিবা॥

অনুবাদ:—জ্বরিত ব্যক্তির অরুচি হইলে তাহাকে অহিতকর দ্রব্যও ভোজন করিতে দিবে। কারণ অন্নকালে (আহারের সময়) আহার না করিলে রোগী ক্ষীণ হয়, অথবা তাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদে আয়ুস্তত্ত্ব।

মধ্যযুগে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ অধুনা বহু কৃতবিদ্য লোকের যত্ন ও চেষ্টায় ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা বাস্তবিকই আমাদের আশা ও সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। দেহীমাত্রেরই সুস্থ দেহ ও স্বচ্ছন্দমনে জীবনের দীর্ঘতা চিরবাঞ্ছনীয়। অশীতি-পর বৃদ্ধেরও জীবিতাকাঙ্খা বলবতীই রহিয়া যায়। সংসারের ত্রিতাপ যাঁহাদের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত না করিয়াছে, তাঁহাদের সুস্থমন ও সুস্থদেহ যে চির স্পৃহণীয় তাহা স্বাভাবিক। এক্ষণে কি কি উপায়ে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের আধারভূত এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ও মন অব্যাহত ভাবে সংরক্ষিত হয় তাহার উপায় জীব মাত্রেরই অনুসন্ধেয়, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ মানব ও জগতের হিতকামনায় ইহ পরত্র মঙ্গলজননী উপদেশাবলী অনেক কাল পূর্ব্বেই প্রচার ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দেশ বৈদেশিকাশিক্ষায় ও অনুচিকীর্ষায় বিভ্রান্ত, তাই আমাদের নিজঘরে অনন্ত রত্ন থাকিতেও আমরা পরের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত, তবে সুখের বিষয় এখন নিজের ঘরে কি আছে জানিবার জন্য অনেক শিক্ষিত লোকের অন্তর্দৃষ্টি দেশীয় শাস্ত্রাদির উপর নিপতিত হইতেছে। সুতরাং এ আন্দোলন ও গবেষণার যুগে সাধারণ্যে ঋষিদিগের অমূল্য উপদেশ প্রচারিত হইয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করিবে বলিয়া আশা করা যায়। আমাদের প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় "আয়ুর্ব্বেদে আয়ুস্তত্ত্ব" সুতরাং প্রথমে আয়ুর্ব্বেদ কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। মহামতি চরক বলিয়াছেন—

"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতং।
মানঞ্চ তচ্চযত্রোক্ত মায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে।

হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ দুঃখায়ুঃ আয়ুর হিত ও অহিত এবং পরমায়ুর পরিমাণ যাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়। তাহাই আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত।

মহর্ষিসুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ শব্দের দুটী অর্থ করেন, "আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে হনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ" যদ্দারা আয়ুর বিষয় জানা যায় কিম্বা যদ্দারা আয়ুলাভ করা যায়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ, সুতরাং আয়ু চেষ্টা দ্বারা ও লভ্য বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারা আয়ুর্ব্বেদ কি এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় কি বুঝিলাম, কিন্তু আয়ুঃ শব্দে শাস্ত্রকারগণ কি ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য। প্রসিদ্ধ শব্দ-তত্ত্ববিদ্ অমরসিংহ বলিয়াছেন "আয়ুর্জীবিত কালো না জীবাতু র্জীবনৌষধং" এতি পরিমাণংগচ্ছতি ইত্যায়ুরিতি উনাদি উস্‌প্রত্যয় দ্বারা আয়ুশব্দ সাধিত হইয়াছে। তবেই বুঝিতেছি জীবিত কালের নামই আয়ুঃ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে এই জীবিতকাল কি আমাদের নির্দ্দিষ্ট? কি অনির্দ্দিষ্ট? সাধারণতঃ কথায় বলিয়া থাকে "ইহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে ইহার মৃত্যুনিশ্চয়, তবে কি আমাদের নিয়মিত বয়সে ও নিয়মিত সময়েই জীবলীলা সমাপন হইয়া থাকে? যদি তাহাই ঠিক হয় তবে কেহ ষোড়শবর্ষে, কেহ দশমবর্ষে, কেহ কেহ জন্মমাত্র, কেহ শতবর্ষে ইহলীলা ত্যাগ

করিতেছ কেন? যদি আয়ুর নির্দ্দিষ্টকাল থাকিত, তবে সকলেরই আয়ুর একটা বাঁধা বাঁধি নিয়ম থাকিত, তাহা যখন দেখিতেছি না তখন আমাদের স্বীকার করিতে হইবে, আয়ুর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই এবিষয় মহর্ষি শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে কি বলিতেছেন শুনুন—

"পথ্যাশিনাং শীলবতাং সদ্বৃত্তভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং এবম্বিধানামিদ মায়ুরত্র চিন্ত্যঃ সদাবৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ"

নিয়তসুপথ্যভোজী এবং চরিত্রবান্ এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টসদাচার পরায়ণ জিতেন্দ্রিয়, ব্যক্তিগণ এই প্রকার (শতবর্ষ পরিমিত) পরমায়ুর অধিকারী। এইবৃদ্ধ মুনি প্রবচন সর্ব্বথা চিন্তনীয়। এবিষয় বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন - "বর্ত্ত্যাধার স্নেহযোগাদ্ যথা প্রদীপস্য সংস্থিতিঃ। বিক্রিয়া-চৈব দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥ যথাঽবিকল বর্ত্ত্যাদিসত্ত্বে প্রবলবাতাদিনা দীপনাশস্তথা সত্যপ্যায়ুষ্যে-শুভকর্ম্মবশান্নৌদুর্গ-বর্ত্মগমন-কুপথ্যাশনাদিভিঃ প্রাণনাশ ইতি।

যেরূপ বর্ত্তি দীপ ও তৈলাদি অব্যাহত থাকা সত্বেও আকস্মিক বায়ু আসিয়া দীপনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমায়ুঃ বর্ত্তমান থাকা সত্বেও অশুভকর্ম্মহেতু নৌকাগমন, দুর্গমপথ গমনে আকাস্মিক বিঘ্ন আসিয়া পরমায়ু ক্ষয় করিয়া থাকে, কুপথ্য ভোজনাদি দ্বারাও আয়ুর পরিমাণ অযথাকর হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আয়ুর কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, এক্ষণে আবার আমরা বলিতেছি—"পরমায়ু থাকা সত্বেও প্রাণ নাশ হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে না" আয়ুর পরিমাণ স্থির নাই আবার পরমায়ু থাকিতে বিনাশ হইতে পারে ইহা কিরূপ হয়?

ইহার স্থূল মীমাংসা এই আয়ুর পরিমাণ ঠিক নাই বটে তবে বর্ত্তমান যুগে শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত কাল মোটামুটি ধরা হইয়া থাকে। এ বিষয় বৈদিক কালে ঋষিদিগের প্রার্থনা বাক্য দ্বারাও দেখিতে পাই -"পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেমশরদঃ শতং" ইত্যাদি। মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অব্যাহতগতি র্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতো।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃ শতম্"

যাহার বায়ু অব্যাহতগতি অর্থাৎ কোন কারণে বাধা প্রাপ্ত হয় নাই, স্বস্থানে ও স্বভাবে অবস্থিত, সে নিরোগী হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে। এ সমস্ত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে,আয়ুর একটী মোটামুটী হিসাব শতবর্ষ পর্য্যন্ত, যিনি সুনিয়ম ও সদাচার সম্পন্ন হইয়া থাকিবেন তিনি ঐ পরিমাণ পরমায়ুর অধিকারী হইবেন। পক্ষান্তরে যোগবলে যে পরমায়ুর পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ আমরা অনেক পাইয়াছি ও অনেক দূরদর্শী প্রাচীন মহাত্মার প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি।

কেবল ইহাই নহে আয়ুর্ব্বেদ স্পষ্টাক্ষরে গুরুশিষ্যসংলাপ স্থলে কি বলিতেছেন শুনুন—

কিন্নু খলু ভগবন্ নিয়তকাল-প্রমাণ মায়ুঃ সর্ব্বং নবেতি? ভগবান্ উবাচ।
ইহাগ্নিবেশ! ভূতানামায়ুর্যুক্তিমপেক্ষতে।
দৈবে পুরুষকারেচ স্থিতং হ্যস্য বলাবলম্।
দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদৈহিকম্।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্।
বলাবলবিশেষো হস্তি তয়োরপিচ কর্ম্মণোঃ।
দৃষ্টংহি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীন মধ্যমমুত্তমম্।
তয়োরুদারয়োর্যুক্তি দীর্ঘস্য সুখস্যচ।
নিয়তস্যায়ুষো হেতুর্বিপরীতস্য চেতরা।

মধ্যাত্মা মধ্যমস্তেষ্টা কারণং শৃণু চাপরং।
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলংহ্যুপহন্যতে।
দৈবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে।
দৃষ্ট্বা যদেকে মন্যন্তে নিয়তং মানমায়ুষঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কালে বিপাকে নিয়তং মহৎ।
কিঞ্চিত্ত্বকাল নিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে॥

ভগবন্! আয়ুর পরিমাণে নিয়ত কাল সাপেক্ষ কি না? ভগবান্ আত্রেয় কহিলেন হে অগ্নিবেশ! জীবদিগের আয়ুঃ যুক্তি (দৈব ও পুরুষকারের যোগ) অপেক্ষা করে, প্রথমতঃ আয়ুর বলাবল, দৈব ও পুরুষকার উভয়ের প্রতি নির্ভর করে, পূর্ব্ব জন্মের স্বকীয় শুভ বা অশুভ কৃত কর্ম্মের নামই দৈবকর্ম্ম। আর পুরুষের বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম সমূহের নাম পুরুষকার কর্ম্ম। তবেই প্রকারান্তরে বলা হই-য়েছে দৈবকর্ম্ম এবং স্বকৃত ও মানবের ইচ্ছা-ধীন। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়বিধ কর্ম্মে-রই একটা প্রবল ও দুর্ব্বল শক্তি মিলিত রহি-য়াছে। হীন, মধ্যম ও উত্তমভেদে কর্ম্ম আবার তিনভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই প্রবলশক্তি থাকিলে আয়ু দীর্ঘ ও সুখকর ও নিয়ত (পূর্ণ) হয়। এস্থলে নিয়ত আয়ুঃশব্দে শতবর্ষবুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ—শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
শাস্ত্রী কবিরত্ন।

হেমন্ত চর্য্যা।

আমরা মুখে বলি, "আহার করি শরীর রক্ষার জন্য", কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, আমরা আহার করি জিহ্বার তৃপ্তির জন্য। যদি সর্ব্বত্র, ইহা শরীরের হিতকর বা ইহা শরীরের অহিত কর এইরূপ বিবেচনা করিয়া আহার করিতাম, তাহা হইলে অনেক উৎকট রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিতাম। সুস্থ শরীরে আহারের হিতাহিত বিবেচনা করাত দূরের কথা আমরা লোভের এতই বশীভূত যে পীড়িত হইয়াও পীড়ার বৃদ্ধি-কর বস্তু জানিয়া শুনিয়া সেবন করিয়া থাকি। মনুষ্যমাত্রেরই এই দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আয়ু-র্ব্বেদাচার্য্যগণ ভূয়োভূয় হিত সেবন ও অহিত বর্জ্জনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাহা জিহ্বার তৃপ্তিকর তাহা সকল সময়েই শরীরের পক্ষে হিতকর হয় না, গ্রীষ্মকালে দধি সেবন আপাত আরামপ্রদ বটে; কিন্তু উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে, অম্লের সহিত মধুর রস যোজনা করিলে—টকের সহিত মিষ্ট মিশাইলে রসনার তৃপ্তি কর হয় বটে কিন্তু সংযোগ বিরুদ্ধ হয় বলিয়া উহা বিবিধ ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে। এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন আমরা সমা-জকে বিবিধ সুস্বাদু আহার-সুখ হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। বস্তুতঃ যাহা শরীরের পক্ষে হিতকর নহে আপাত সুখের জন্য তাহা ভোজন করিয়া পরিণামে পীড়া গ্রস্ত হওয়া কদাপি মনুষ্য মাত্রেরই বাঞ্ছনীয় নহে, সুতরাং যাহাকে আমরা আহার-সুখ বলিয়া মনে করি, অনেক স্থলেই তাহা বিবিধ রোগের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। আজ ঋতুচর্য্যা

লিখিতে বসিয়া এই সকল কথা আলোচনার প্রয়োজন এই যে, ঋতুচর্য্যা কেবল কাল বিশেষের উপযোগী আহার বিহার বিষয়ক হিতকর শাস্ত্রীয় শাসন বাক্য মাত্র। পাঠক যদি ঋতুচর্য্যার উপদিষ্ট আহার বিহারের সহিত নিজ নিজ জিহ্বা ও মনের বিরোধ, অনুভব করেন, তাহা হইলে সেই বিরোধ, বিকার গ্রস্তের শীতল পানীয় প্রার্থনার ন্যায় অহিতকর ভাবিয়া, শাস্ত্রশাসন পালন পূর্ব্বক নিজের এবং সমাজের হিত সাধন করিবেন।

শরচ্চর্য্যা প্রসঙ্গে ঋতু বিভাগের বিষয় বলা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে সম্প্রতি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের বিষয় বলা যাইতেছে।

অয়ন বিভাগ কেবল আয়ুর্ব্বেদের বিষয়ীভূত নহে পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ও উহার বহুল উল্লেখ আছে। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেব উত্তর পথে গমন করেন বলিয়া এই তিনটী ঋতু উত্তরায়ণ এবং এই জন্যই পৌষ সংক্রান্তি উত্তরায়ণ নামে খ্যাত। আর বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকালে সূর্য্যদেব দক্ষিণ পথে গমন করেন বলিয়াই এই তিনটী ঋতুকে দক্ষিণায়ণ বলে।

উত্তরায়ণে সূর্য্যকিরণ প্রখর হয় এবং বায়ু তীব্র ও রুক্ষ হয় বলিয়া পৃথিবীর স্নেহ ও রস শোষিত হইয়া থাকে, এই জন্য শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পৃথিবীতে ক্রমশঃ রুক্ষভাবের আধিক্য হয়, শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যথাক্রমে তিক্ত, কষায় ও কটুরসের বৃদ্ধি হয় এবং মনুষ্যের শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে, উত্তরায়ণে সূর্য্য পৃথিবীর রস গ্রহণ করেন বলিয়া উহা আদানকাল নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। আদান কাল আগ্নেয় অর্থাৎ এই সময়ে উষ্ণতার আধিক্য হয়।

দক্ষিণায়ণে কালস্বভাব অনুসারে মেঘ, বায়ু ও বর্ষার জন্য সূর্য্যের তেজ মন্দীভূত হয় এবং চন্দ্রমা, বলবান্ হইয়া স্বীয় শীত রশ্মি দ্বারা জগতকে স্নিগ্ধ করেন, এই জন্য দক্ষিণায়ণ সৌমকাল অর্থাৎ এই সময়ে জগতে সোমগুণের (শৈত্যাদির) আধিক্য হয়, বর্ষার জলে জগতের সন্তাপ দূর হয়, অরুক্ষ রস সকলের অর্থাৎ অম্ল, লবণ ও মধুর রসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় এব মানবগণ ক্রমশঃ বলবান্ হয়, এই কালে সূর্য্য-তেজ-শোষিত পৃথিবীতে চন্দ্র স্বীয় সোম গুণ বিসর্জ্জন করেন বলিয়া ইহা বিসর্গকাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আদান কালের শেষে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং বিসর্গ কালের প্রথমে অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা হীনবল হয়। আদান কালের মধ্যে অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে এবং বিসর্গ কালের মধ্যে অর্থাৎ শরৎ ঋতুতে মনুষ্য মধ্যবল হয়। আর আদান কালের প্রথমে অর্থাৎ শীত ঋতুতে এবং বিসর্গ কালের শেষে অর্থাৎ হেমন্ত ঋতুতে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ হয়।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস হেমন্তকাল, সম্প্রতি হেমন্তকাল চলিতেছে বলিয়া হেমন্ত চর্য্যাব বিষয় লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শীত উষ্ণ ও বর্ষণ লক্ষণাক্রান্ত তিনটী ঋতুই প্রধান এবং অপর তিনটী ঋতু উহাদের অন্তর্ব্বিভাগ। এই হিসাবে হেমন্ত ঋতু শীতের অন্তর্ব্বিভাগ, এই সময়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শরীরস্থ উষ্মা নির্গত হইতে পায় না বলিয়া জঠরাগ্নি প্রবল হয় এবং গুরুপাক দ্রব্য অধিক মাত্রায় জীর্ণ করিতে পারা যায়, সেই প্রবল অগ্নি উপযুক্ত আহার রূপ ইন্ধন না পাইলে দেহস্থিত রসের ক্ষয় করিয়া থাকে এবং উপযুক্ত আহারের অভাবে বায়ু রুক্ষ ও শৈত্যগুণযুক্ত হইয়া

কুপিত হয়, এইজন্য হেমন্তকালে স্নিগ্ধ (ঘৃতাদিযুক্ত) অম্ল, লবণ ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আহার করা উচিত।

ঔদক মাংস (জলজ মাংস মৎস্যাদি) আনূপমাংস (জলাশয় সমীপে বিচরণকারী প্রাণীর মাংস শূকর মহিষাদি), বিলেশয় মাংস (যে সকল প্রাণী গর্ত্তমধ্যে বাস করে তাহাদের মাংস—গোধা সজারু প্রভৃতি) প্রসহ মাংস গবাদি, প্লবমাংস, (যাহারা জলে ভাসিয়া বেড়ায় হংসাদি) শলাকায় বিদ্ধ করতঃ সিদ্ধ করিয়া (শূল্যমাংস, শিক কাবাব) আহার করিবে, গোধূম ও মাষ কলায় দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, পিষ্টক, গুড়, চিনি, মিছরী, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, নূতন অন্ন, চর্ব্বি, তৈল প্রভৃতি সেবন করিলে দেহের ক্ষয় নিবারিত হইয়া পুষ্টি সাধিত হয়।

হেমন্তকালে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষরূপে বায়ুনাশক তৈল মর্দ্দন, মস্তকে তৈল মর্দ্দন ও ঈষদুষ্ণ জলে স্নান হিতকর, রেশমী ও পশমী কাপড়ের দ্বারা শরীর আবৃত রাখা এবং গরম কাপড়ের আসন ও শয্যা ব্যবহার করা উচিৎ। উষ্ণগৃহে বা গর্ভগৃহে (মৃত্তিকাভ্যন্তরে নির্ম্মিত গৃহে) অবস্থান ও শয়ন হিতকর, এই সময়ে সর্ব্বদা জুতা ও ইকোন প্রভৃতি পাদত্রাণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শৌচকর্ম্মে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করা উচিত এবং সূর্য্যরশ্মির অল্পতা প্রযুক্ত শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জড়ীভূত মানব মণ্ডলীর যথোপযুক্ত অগ্নিস্বেদ ও রৌদ্র সেবন করা কর্ত্তব্য ও প্রতিদিন কুস্তী করা কিম্বা বিবিধ ব্যায়াম করা আবশ্যক।

ছয় ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ঋতুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণিগণের সমধিক বলপ্রদ, কারণ বর্ষাকালে উৎপন্ন শস্যাদি ও যাবতীয় ওষধি দ্রব্য, কাল পরিণাম বশতঃ এই সময়েই অধিক বীর্যবান হয় ও পরিপুষ্টি লাভ করে। পৃথিবী পঙ্কহীন হওয়ায় পানীয় জল স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল হয়, তৎসমস্ত ভক্ষণ ও পান করিয়া এবং জঠরাগ্নির প্রবলতায় সুজীর্ণ করিতে পারায় জীবগণ হৃষ্ট পুষ্ট হয়, কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ ও হস্তী প্রভৃতি এই সময়ে বিশেষ বলশালী হইয়া থাকে সুতরাং বলসঞ্চয় করিবার পক্ষে ইহাই উৎকৃষ্ট কাল।

এই কালে রাত্রি দীর্ঘ হয় বলিয়া প্রাতে শৌচাদি নিত্যকার্য্য শেষ করিয়াই কিছু আহার করা উচিত। লঘু আহার অল্পাহার, বায়ুবর্দ্ধক অন্ন পান এবং পূর্ব্বদিকের প্রবাহিত বায়ু অনিষ্ট কর। এই ঋতুতে নিত্য স্ত্রীসেবি ব্যক্তির পক্ষে প্রচুর মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি বাজী-কারক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। এই কালে স্নিগ্ধতা, শৈত্য গুরুত্বাদির আধিক্য নিবন্ধন শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইতে থাকে।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত।

চরকোক্ত ষড়ুপায় বিধি।

লঙ্ঘণ, বৃংহণ আর রুক্ষণ, স্নেহন,
স্বেদন, স্তম্ভন কার্য্যে নিপুণ যে জন,
প্রয়োগ করিতে জানে বুঝিয়া সময়,
প্রকৃত ভিষক সেই জানিবে নিশ্চয়।
সর্ব্ব রোগে লঙ্ঘনাদি চিকিৎসা সম্যক্।
ফলে, মাত্রা বিচারিয়া করিলে প্রয়োগ।
সাধ্য-ভাবাপন্ন সব রোগারোগ্য হয়।
তেঁই ষড়ুপায় বিধি কহি সমুদয়॥
যাহা দেহ লঘুকর তাহাই লঙ্ঘন।
পুষ্টিকর হয় যাহা সেসব বৃংহণ॥
কর্কশতা, বিষদতা, রুক্ষতা জনক।
সমস্ত দ্রব্যই হয় রুক্ষণ-সংজ্ঞক॥
স্নিগ্ধ, অভিষ্যন্দি, মৃদু, ক্লেদ যাতে হয়।
স্নেহন তাদের নাম সুধীগণ কয়।
স্তব্ধতা রুক্ষতা শৈত্য নষ্ট যাতে হয়।
স্বেদ কর হয়, তাহা স্বেদন নিশ্চয়॥
গতিমান্, সচঞ্চল, দ্রব পদার্থের।
গতি রোধ করে, নাম স্তম্ভন তাদের॥
লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিশদ, কঠিন, *
সূক্ষ্ম, খর, সরদ্রব্য লঙ্ঘন প্রবীণ।
গুরু, মৃদু, স্নিগ্ধ, স্থূল, স্থির, মন্দ, ঘন,
শীতল, পিচ্ছিল, শ্লক্ষ্ণ দ্রব্যাদি বৃংহণ।
রুক্ষ, লঘু, খর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ আর স্থির,
অপিচ্ছিল, কঠিনাদি রুক্ষণ সুধীর॥
দ্রব, স্নিগ্ধ, সব, স্থূল, পিচ্ছিল, শীতল,
গুরু, মন্দ, মৃদুদ্রব্য স্নেহন সকল।
উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সর, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, সূক্ষ্ম, দ্রব,
স্থির, গুরু দ্রব্য হয় স্বেদন এসব॥
শীতল, মন্দ ও মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, রুক্ষ, স্থির,
সূক্ষ্ম, লঘু, দ্রবদ্রব্য স্তম্ভন সুধীর।

* দ্রব্যখণ্ডে এই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে।

লঙ্ঘন বিধি।

বমি, বিরেচন দুই আর আস্থাপন,
শিরো বিরেচন, এই চারি সংশোধন।
তৃষ্ণা, বায়ু, রৌদ্র আর ব্যায়াম, পাচন,
উপবাস, এই সবে কহিবে লঙ্ঘন॥
শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, মল, যাদের সঞ্চিত,
দীর্ঘ দেহ, বলবান, বায়ু সংদূষিত;
তাহাদের বমনাদি চারি সংশোধন।
প্রয়োগ করিয়া বৈদ্য করায় লঙ্ঘন॥
মধ্যবল-শালী রোগ, কফ পিত্তোত্থিত,
অতিসার, হৃদরোগ, বিসূচীকান্বিত;
বমি, জ্বর, অলসক, হৃল্লাস, উদ্গার,
মল বদ্ধ, গাত্রশূল, অরুচি যাহার;
তাহাদের প্রথমতঃ প্রাজ্ঞ বৈদ্যগণ,
প্রায়ই পাচন দ্বারা করে প্রশমন॥
বমনাদি অল্প বল, কফ পিত্তোদ্ভুত।
তৃষ্ণারোধ, উপবাসে হয় দূরীভূত॥
মধ্য-বল-শালী রোগ হয় যে সকল।
হরে রৌদ্র, বায়ু সেবা, ব্যায়ামে কেবল॥
বলবান ব্যক্তিদেব অল্প বলান্বিত।
রোগহ'লে এ উপায়ে আশু বিদূরিত॥
স্নেহরোগাক্রান্ত, যার, ত্বক্ দুষ্ট হয়।
অতিযোগে গুহ্যমার্গে স্নেহ বাহিরয়॥
বাত ও বৃংহণ যুক্ত হ'য়েছে যাহারা।
লঙ্ঘনের উপযুক্ত শীতকালে তারা॥

লঙ্ঘনের ক্রিয়া।

যে দ্রব্যে বা কর্ম্মে দেহ লঘুবোধ হয়।
তাহাই লঙ্ঘন, কিন্তু বৃংহণ তা নয়॥
লঙ্ঘনেতে দোষ ক্ষয়, অগ্নি উদ্দীপিত।
দেহ লঘু, ক্ষুধাবোধ, জ্বর বিবর্হিত।
দোষ অগ্নি স্থান চ্যুত, অসম যাহার।
লঙ্ঘনে দোষের পাক, জ্বর নাশে তার॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাসবিহারী রায়।

আমরা অতীব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে যোগ দান করিয়াছেন।

মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর মানিক্য বাহাদুর (ত্রিপুরা)।

শ্রীযুক্ত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

,, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম্, এ,

শ্রীযুক্ত অন্নদা কুমার রায় চৌধুরী জমীদার কীর্ত্তি পাশা, বরিশাল।

,, জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, জমীদার গোবরডাঙ্গা।

,, নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল, ঢাকা।

,, রায় চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, রিঃ ডেপুটী মাজিঃ।

,, রায়সাহেব আশুতোষ মুখার্জ্জি বি, এল,

,, কে, সেন, স্কোয়ার সিভিল সার্জ্জন, (পাবনা)।

,, সারদা চরণ ঘোষ গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, ময়মনসিংহ।

,, রাম রতন চট্টোপাধ্যায়, উকীল, ভবানী পুর।

,, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বি, এ, এম, আর, এস।

,, ডাঃ হরিধন দত্ত,

,, ,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঢাকা।

,, ,, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, এল, এম, এস।

,, ,, জ্যোতির্ম্ময় বানার্জ্জি এম, বি,

,, ,, ইউ বসু—(কলিকাতা)

,, ,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম, এস,

ডাঃ শ্রীযুক্ত জে, এন, সেন -বিলাস পুর।

,, ,, অমূল্য চন্দ্র উকিল এম, বি।

,, ,, টি, সি, ভট্টাচার্য্য।

,, ,, এস, সান্যাল এম, বি।

,, ,, অমরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি, এল, এম, এস, কলিকাতা।

,, ,, বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস।

,, ,, বি, এন ঘোষ, আল্‌বার্ট ভিঃ হাসপাতাল।

,, ,, সুরেন্দ্র কুমার মজুমদার, এল, এম, এস।

,, ,, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস, বেনারস।

,, ,, নলিনী রঞ্জন সেন গুপ্ত এম, ডি,

শ্রীযুক্ত বি, ডি, মুখার্জ্জি,

,, কেশবচন্দ্র গুপ্ত,

,, বরদাকান্ত সেন গুপ্ত,

,, নগেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত,

,, প্রিয় শঙ্কর মজুমদার, উকিল।

,, কান্তীশভূষণ সেন, আই, এস, ও,

,, দ্বিজেন্দ্র কুমার মজুমদার, এম, এ, বি, এল।

,, হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত,

,, কামিনী কুমার সেন, উকিল।

,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,

,, ভূতনাথ পাল, (কলিকাতা)

,, যতীন্দ্রমোহন সেন, উকিল হাইকোর্ট।

,, চন্দ্রশেখর সরকার, উকিল, ভাগলপুর।

,, বিভূতিভূষণ দত্ত, এম, এস, সি।

,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু,

,, যতীন্দ্রনাথ বসু,

শ্রীযুক্ত এ, সি, রায়, সম্পাদক, "রিজেনারেশন।"
,, রাজকুমার রায়, ফরিদপুর।
,, বসন্তকুমার আইচ, যশোহর।
,, প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়, মুন্সেফ।
,, রাখাল দাশ মুখোপাধ্যায়, বি, এল, উকিল কাঁথি।
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, শীতলচন্দ্র ঘোষ।
,, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।
,, কিরণকুমার রায় চৌধুরী।
,, বি, কে, সেন, হুগলী,।
,, ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন।
,, সনৎকুমার ঘোষাল।
,, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উকিল আলিপুর।
,, বীরেশ্বর সেন গুপ্ত, উকিল ফরিদপুর।
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম এ, বি, এল, উকিল হাইকোর্ট।
,, নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, উকিল বগুড়া।
,, নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইঞ্জিনীয়ার।
,, মনোমোহন পাঁড়ে।
,, দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।
,, প্রিয়দারঞ্জন রায় এম, এ,
,, অমৃতলাল গুপ্ত, বি, এল, সবডিঃ অফিঃ বাঁকীপুর।
,, অধ্যাপক এন, এন, সেন গুপ্ত।
,, বিজয়চন্দ্র সিংহ কলিকাতা।
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ডিওলজিষ্ট।
,, নেপালচন্দ্র রায় এম, এ,
,, ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, রংপুর।
,, যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ, সাহ্যরত্ন, যশোহর।
,, দীনেশচন্দ্র চাটার্জ্জি, মুন্সেফ।
,, কবিরাজ মধুসূদন সেন গুপ্ত, ভিষগ্‌রত্ন।
,, ,, পূর্ণচন্দ্র দাস গুপ্ত, ঢাকা।
,, ,, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ।
,, ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় কবিরঞ্জন, মোরাদপুর।
,, ,, কৃষ্ণকুমার সেন গুপ্ত।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্বীকার।

আমারা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ—চরকসংহিতা (সানুবাদ) এক খানি।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ রাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন—(১) আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ববিজ্ঞান পূর্ব্ব ও মধ্যখণ্ড (২) চণ্ডীচরিতামৃত (দেবীমাহাত্ম্য)।

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত রামতারণ চট্টোপাধ্যায় - উকীল ভবানীপুর—১০০৲।

মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তাঁহার স্বর্গগত ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের (ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন) স্মৃতিরক্ষা কল্পে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে ঐ টাকার সুদ হইতে তাহাকে পদক দান করা হইবে।

পৌষের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। টাকাকড়ি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, ৪৬নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। ১৫ তারিখের মধ্যে কাগজ না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক পৃষ্ঠা	বা	দুই কলম		৮৲
"	আধ "	"	এক	"	৪॥০
"	সিকি "	"	আধ	"	২৸০
"	অষ্টাংশ "	"	সিকি	"	১॥০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন
"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট্, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন মেসিন প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

মাঘ, ১৩২৩ 1.21 "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।

দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৩—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

বৈদ্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

এস্থলে অহিতকর দ্রব্য দেওয়ার উদ্দেশ্য রুচির জন্য। একটু কুপথ্য-সংযোগেও যদি রোগী সুপথ্য আহার করিতে পারে—এই উদ্দেশ্য। নচেৎ কেবল কুপথ্য দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। অনেকে "জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াৎ" পাঠ করিয়া "জ্বরিত ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে"—এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। জ্বরিত ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে, ইহাত সাধারণ নিয়ম। তবে অরুচি হইলে হিতকর দ্রব্য ভোজন করিবে বলার সার্থকতা কোথায়? সুতরাং অহিতকর দ্রব্য বলাই শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য। অপিচ শাস্ত্রে না পাইলে আর একটী বচন আমরা অবগত আছি যে:—

"কুপথ্যমপি দাতব্যং যদি পথ্যং ন রোচতে।"

অর্থাৎ পথ্য রুচিকর না হইলে কুপথ্যও দিবে।

পথ্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর উপদেশ আর কোন দেশের চিকিৎসা-শাস্ত্রে আছে কি?

সন্নিপাত জ্বরে উপবাসসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে;—

"ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা।
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদারোগ্যদর্শনাৎ॥"

অনুবাদ;—সন্নিপাত জ্বরে তিন দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন অথবা যতদিন রোগ প্রশমিত না হয়, ততদিন উপবাস দিবে।

সন্নিপাত জ্বরে এইরূপ লঙ্ঘন যে হিতকর তাহা পাশ্চাত্যদেশীয় চিকিৎসকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন,—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি আমার কোন সন্নিপাতজ্বর-রোগীকে একুশ দিন পর্য্যন্ত বাখিন (ছানার জল, Whey) পথ্য দিয়া ছিলাম। আর একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালককে আট দিন কাল কেবল গরম জল পথ্য দিয়া ছিলাম। উভয় রোগীই কথিত সময়ে আর কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে নাই এবং ঐ সময়ান্তে অন্যান্য পথ্য আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। তখন অন্য পথ্য দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য উভয়ত্রই রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। এরূপ অধিক লঙ্ঘন সহ্য হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন;—

"দোষাণমেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
নহি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনাদিকম্॥"

অনুবাদ :—দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফের) শক্তি বশতঃ এরূপ লঙ্ঘন সহ্য হয়, দোষের ক্ষয় হইলে কেহই লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদের এই বচন যে সম্পূর্ণ সার্থক, তাহা আমরা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং সমবেত সভ্য মহোদয়গণের মধ্যে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণও দেখিয়া থাকিবেন।

আয়ুর্ব্বেদে প্রতিরোগে এরূপ বহুবিধ সারবান্ উপদেশ আছে। আমরা সময়াভাববশতঃ এবং বাহুল্যভয়ে সে সকলের উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

অনেকের বিশ্বাস যে আয়ুর্ব্বেদে মাংসপথ্যের প্রয়োগ নাই বা অত্যন্ত কম। কিন্তু এই বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনারা অবগত আছেন যে ভিন্ন ভিন্ন রোগে নানা প্রকার প্রাণীর মাংস পথ্যরূপে প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ক্ষীয়মাণ যক্ষ্ম রোগীর বলপুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য প্রধানতঃ ছাগমাংস ব্যবহার করিবার বিধি আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাকোবিদগণ বিজ্ঞানবিহিত অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু অন্যান্য পশু পক্ষীর শরীরে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা রোগ উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু ছাগ ও মেষের শরীরে রোগ উৎপাদন করিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদে ছাগমাংস, ছাগশোণিত এবং ছাগদুগ্ধ যক্ষ্মারোগীকে সেবন করাইবার উপদেশ দেওয়ায় স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে ঐ মহান্ বৈজ্ঞানিক সত্য তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া পারা যায় না।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥

অনুবাদ :—ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ ও চিনিমিশ্রিত ছাগঘৃতসেবন, ছাগসেবা এবং ছাগমধ্যে শয়ন করা যক্ষ্ম-রোগনাশক।

পথ্যাপথ্যজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদের বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশবাসীর ধাতু-প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞানের অভাববশতঃ পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের উপদিষ্ট পথ্যাপথ্য যে বিপরীত ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি!

মাননীয় সভাসদ্ মহোদয়গণ! এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা আয়ুর্ব্বেদের পরম গৌরবের পরিচায়ক। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিব। এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধে যে সকল মধুময় কথা বলিয়াছি, তাহা শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া আপনাদের হর্ষ উৎপাদন করিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে যাহা বলিব, তাহা বিষময় বলিয়া আপনাদের দুঃখ উৎপাদন করিবে,—এইরূপ আশঙ্কা করিতেছি। কিন্তু যদি আমরা কেবল গুণের দিকেই দৃষ্টি রাখি এবং দোষকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের সে সকল দোষ কখনই সংশোধিত হইবে না। অপিচ এরূপ করিলে আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে যে দায়িত্বপূর্ণ মহৎ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত সম্মান করা হইবে না, বরং অবমাননা করা হইবে। সুতরাং এক্ষণে আমি যাহা বলিব, তাহা অপ্রিয় হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আয়ুর্ব্বেদ জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলভূত। অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রকে এই মহান্ আয়ুর্ব্বেদ-বৃক্ষের

শাখাজাত ক্ষুদ্র বৃক্ষস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ভারতের অতীত গৌরবের বিষয় আলোচনা করিলে আমাদের মনে যেরূপ সুমহান্ আনন্দের উদয় হয়, আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে সেইরূপ ক্ষোভে দুঃখে ও লজ্জায় হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। আয়ুর্ব্বেদ হইতে মূলসূত্র সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু কাল ধরিয়া কত কষ্ট স্বীকার করিয়া অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে কতই না উন্নতি সাধিত করিয়াছেন! আর আমরা স্বার্থ-পরতা, অবহেলা ও অশ্রদ্ধায় অন্ধ হইয়া আমাদের সেই জাতীয় গৌরব আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া তুলিয়াছি। ভাষায় এমন কথা নাই, কথার এমন শক্তি নাই, শক্তির এমন বিকাশ নাই যে—এই মর্ম্মভেদী দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিয়া বলা যাইতে পারে!

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য যেরূপ স্বার্থত্যাগ, বিপুল চেষ্টা এবং অপেক্ষণীয় ক্লেশ স্বীকার করিবার শক্তি আবশ্যক, সে শক্তি এক্ষণে আমাদের নাই। শারীর তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শবব্যবচ্ছেদ যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এক্ষণে শবব্যবচ্ছেদ করেন না বলিয়া শারীরতত্ত্বে তাঁহাদের ব্যুৎপত্তির অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের শারীর বিজ্ঞান যাহা পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং শল্যতন্ত্রে যাহা গ্রন্থবদ্ধ আছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। সকল ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ বস্তিপ্রয়োগে এক্ষণে আমরা অক্ষম। অধিক কি, এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় না জানিয়াও চিকিৎসা-কার্য্যে উদ্যত হইয়া আমরা বিজ্ঞান-জ্যোৎস্না-সমুদ্ভাসিত নানা চিকিৎসোপায়সমলঙ্কৃত যুগে বিশেষজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের এবং অন্যান্য বিবেচক ব্যক্তির নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িয়াছি। ইহা কি আমাদের পক্ষে বিশেষ লজ্জাকর নহে? আমরা আয়ুর্ব্বেদানুসারী চিকিৎসক বলিয়া বৈদেশিক চিকিৎসকদিগের শারীর শল্যতত্ত্বাদি সরল ও সুলভ রীতিযুক্ত হইলেও তাহা আমাদের জ্ঞাতব্য বলিয়া মনে করি না; অথচ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত বহু বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের অভাব ঘটিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীর জীবনমরণের ভার লইয়া অবৈজ্ঞানিক পথ আশ্রয় করিয়া আমরা কি পূজনীয় মহর্ষিদিগের তপস্যার ফলভূত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অবমাননা করিতেছি না এবং পরমার্থতঃ অপরাধী হইতেছি না? শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে;—

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ॥

অনুবাদঃ—গুরুর মুখ হইতে সমগ্র শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং তাহা বারংবার অনুশীলন করিয়া যে বৈদ্য চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রকৃত বৈদ্য; অন্যকে তস্কর বলিয়া জানিবে।

শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের বিষয় অবগত না হইয়া, শস্ত্রচিকিৎসা ও বস্তিকর্ম্মাদিশিক্ষা না করিয়াও আমরা যে এখনও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হই, সে কেবল আয়ুর্ব্বেদের ভেষজবিজ্ঞানের মহত্ত্ববশতঃ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভেষজবিজ্ঞান জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, পরিবর্ত্তনশীল নহে; এবং দেশ, কাল, পাত্রভেদে উপযোগী। অন্য দেশের ভেষজবিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভেষজবিজ্ঞানকে কখনও

পরাভূত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই ভেষজবিজ্ঞান সংস্কারের পূর্ব্বে, শবব্যব-চ্ছেদাদি দ্বারা শারীরতত্ত্ববিজ্ঞানের জন্য আমা-দের যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সহিত মহান্ আয়াস স্বীকার করা আবশ্যক। পঞ্চকর্ম্মের এক-মাত্র বিরেচনই আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ ভাবে; আয়ুর্ব্বেদোক্ত ছয় শত বিরেচনের মধ্যে এক্ষণে পাঁচ ছয়টীর অধিক ব্যবহৃত হয় না। অবশিষ্টগুলি কেবল গ্রন্থের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে মাত্র—কদাপি প্রযুক্ত হয় না। বিরেচন যে এক্ষণে যথাবিধি প্রয়োগ করা হয় না—তাহা নিম্নলিখিত বচনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। যথা:—

স্নিগ্ধায়, স্বিন্নাবান্তায় দাতব্যস্তু বিরেচনম্।
অন্যথা যোজিতং হ্যেতদ্ গ্রহণীগদকৃন্মতম্॥

অনুবাদ:—রোগীকে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া, পরে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া, পরে বমি করাইয়া, তৎপরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। অন্যথা করিলে গ্রহণীগত রোগ জন্মিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদের ভেষজবিজ্ঞান এতই উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে সদ্যোমারাত্মক কৃষ্ণসর্পবিষও ঔষধের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সর্পবিষ উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও ও যে পুনরুজ্জীবিত করে, আমরা তাহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে বিষপ্রয়োগকুশল চিকিৎসক ক্রমেই বিরল হইতেছে।

শালাক্য, অগদ, কৌমারভৃত্য, রসায়ন ও বাজীকরণ তন্ত্রও অধুনা যথাবিধি অভ্যাস করা হয় না। ঐ সকল তন্ত্রের অপ্রচলন-হেতু আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা সাধারণের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িতেছে, ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। এই সকল তন্ত্রের সুপ্র-চলনের জন্য আমাদের যথেষ্ট যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পরিতাপকর হইলেও একটি অনুপেক্ষণীয় বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিগোচর হইতেছে। আমার পরিচিত জনৈক রাজবৈদ্য শিবিকারূঢ় এবং অনুচরবেষ্টিত হইয়া কোন রোগীর চিকিৎসার্থ দূরদেশে যাইতে ছিলেন। পথে কোন গ্রামে কতকগুলি নিতান্ত উৎকণ্ঠিতচিত্ত গ্রাম-বাসীকে দেখিতে পাইলেন। এদিকে ঐ লোকগুলি কবিরাজ মহাশয়ের দেখা পাইয়া গ্রামস্থ কোন আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে—এই কথা তাঁহাকে নিবেদন করিল এবং অত্যন্ত কাতর-ভাবে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। জনিষ্যমান বালকের এক হস্ত যোনিবিবর-পথে নির্গত হইয়াছিল, সুতরাং চিকিৎসকের সাহায্যব্যতীত প্রসবের কোন উপায় ছিল না। এ দিকে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন চিকিৎসক পাওয়া যায় না। এই বিষয় জানাইয়া তাহারা বলিল,—আপনি কৃপাপূর্ব্বক গর্ভিণীকে প্রসব করাইয়া দুইটী প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করুন। কবিরাজ মহাশয় সেই করুণ আহ্বান শুনিয়া ও এইরূপ ব্যাপারে নিজের শক্তিহীনতা স্মরণ করিয়া আন্তরিক কষ্ট অনুভব করিলেন এবং লজ্জা ত্যাগ করিয়া নিজের অসামর্থ্যের বিষয় গ্রামবাসীদিগকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীগণ মনে করিল যে আমরা রাজ-বৈদ্যের উপযুক্ত অর্থদান করিতে অক্ষম বলিয়া কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে অসম্মত হইতেছেন। সুতরাং তাহারা কবিরাজ মহাশয়ের কথায় বিশ্বাস না করিয়া গর্ভিণীকে দেখিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল। অগত্যা কবিরাজ মহাশয় ভীতচিত্তে গ্রামবাসীদিগের সহিত যাইয়া সেই অভাগিনী গর্ভিণীকে দর্শন

করিলেন। কিন্তু দেখিয়া কি হইবে? কবিরাজ মহাশয় গর্ভিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, পরে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে গ্রামবাসীদিগকে বলিলেন যে—আপনারা ইহাকে আমাদের রাজপুরের ডাক্তারখানায় লইয়া যান; সেখানকার ডাক্তারবাবু ইহাকে প্রসব করাইবেন। কি পরিতাপের বিষয়! সম্মুখে দুইটি প্রাণী মরণোন্মুখ, নিকটে চিকিৎসক; কিন্তু চিকিৎসক শক্তিহীন। যে বৃত্তান্ত আজ আপনাদের সমক্ষে বিবৃত করিলাম, তাহা বিবেচনা করিয়া আপনারা বিচার করুন যে—এরূপ অবস্থায় পতিত শরণবিহীনা দরিদ্রা রমণীকে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক স্বয়ং সাহায্য করিতে অক্ষম হইয়া যদি পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন, তবে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব কোথায় রহিল? আর এরূপ চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষারই বা সার্থকতা কি?

ঔষধ প্রস্তুতের জন্য আবশ্যক নানাপ্রকার ধাতু ও উদ্ভিজ্জের নাম এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সে গুলির অধিকাংশই আমরা চিনি না এবং ব্যবহার করি না। সুতরাং যে সকল রোগ ঐ সকল অজ্ঞাত ধাতু বা ওষধির দ্বারা সহজে নিরাকৃত হইতে পারিত, সে গুলির নিরাকরণ করা সংপ্রতি আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য, ক্ষেত্রবিশেষে অসাধ্যও হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের স্বরূপজ্ঞান এবং প্রাপ্তির উপায়ের জন্য আমাদের যথোপযুক্ত চেষ্টা করা উচিত।

আরও দেখুন, অধুনা যে সকল মুদ্রিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়, সে গুলি শব্দতঃ ও অর্থতঃ অত্যন্ত ভ্রমবহুল বলিয়া পাঠার্থীদিগের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং সে গুলিকে ভ্রমরহিত করিয়া মুদ্রিত করা নিতান্ত আবশ্যক। অনতিপ্রাচীন টীকাকারগণের টীকায় প্রমাদ বা অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুপযোগী হইলেও ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রাদিতে স্বকীয় ব্যুৎপত্তি দেখাইবার আগ্রহবশতঃ অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ইহাতে পাঠার্থীদিগের বুঝিবার সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল টীকাকারদিগের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে।

চিকিৎসা-কার্য্যের উপযোগী আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে আমাদের প্রীতির চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য। যদি আমরা প্রাচীনদিগের প্রতি ভক্ত্যাতিশয্যবশতঃ আধুনিক প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করি, তাহা হইলে আমরা অবনত ব্যতীত উন্নত হইতে পারিব না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রকে বিশেষ উন্নত করিয়াছে, তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমি ঐ সকল আবিষ্কারের মধ্যে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের বিষয় এবং তাহাদের উপযোগিতার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। (১) এক্স রে যন্ত্র (X' Ray apparatus) ইহা এক প্রকার আলোক। এই আলোকের সাহায্যে শরীরের অন্তর্নিহিত শল্য (বন্দুকের গুলি প্রভৃতি) দেখা যায় এবং অভ্যন্তরীণ ভগ্ন স্থান বা সন্ধিচ্যুতি সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

(২) অক্‌সিজেনের শ্বাসগ্রহণ oxygen inhalation), বায়ুস্থিত অক্‌সিজন আমরা নিয়ত গ্রহণ করিতেছি, তদভাবে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না। নিউমোনিয়া, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, অত্যন্ত রক্তহীনতাপ্রভৃতি

রোগে যখন শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটিয়া মৃত্যু হইবার আশঙ্কা হয়, তখন অক্সিজেনের শ্বাস গ্রহণ দ্বারা জীবন রক্ষা হইয়া থাকে।

(৩) উপশিরা বা চর্ম্মভেদ করিয়া লবণ জল প্রয়োগ (Saline injection intravenous and subcutaneous)—কলেরা-রোগে শরীরস্থ জলীয়াংশ এবং লবণ অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হইয়া যায় বলিয়া সত্বর মৃত্যু ঘটে। উপশিরা (Vein) কিম্বা চর্ম্মভেদ করিয়া লবণজল প্রয়োগ করিলে অনেক সময় ঐ করাল রোগের কবল হইতে রোগীর প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে। সহসা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে ঐরূপে লবণজল প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(৪) 'এমিটিন'নামক ঔষধ :—এমিবা (Amoeba) নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আছে এবং তাহারা মানব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া এক প্রকার প্রবাহিকা রোগ উৎপন্ন করে। উহাকে জীবাণুজাত প্রবাহিকা (Amoebic dysentery) বলা যায়। সূক্ষ্মমুখ পিচকারী দ্বারা চর্ম্ম ভেদ করিয়া এমিটিন (Emetine) প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য উপকার হয়।

৫। ডিপথিরিয়া বিষনাশক ঔষধ (Diphtheria Antitoxin) :—ডিপথিরিয়া নামক এক প্রকার গলরোগ আছে, সম্ভবতঃ উহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোহিণী-রোগ। এই রোগ পূর্ব্বে অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। আয়ুর্ব্বেদেও এইরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ঔষধ আবিষ্কৃত হইবার পর ঐ রোগে শতকরা পাঁচজনের অধিক রোগীর মৃত্যু হয় না।

৬। কলি ভ্যাকসিন (Colli Vaecine) সূতিকা জ্বর এবং সেপটী সেমিয়া (Sceptic cemia) নামক শোণিতবিষাক্তকারক রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা জীবাণুতত্ত্বসম্বন্ধে গবেষণার একটী মধুময় ফল।

রোগনির্ণয়ের জন্য যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলিও যথাসম্ভব আমাদের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল যন্ত্রের মধ্যে ষ্টিথেস কোপ (Stethescops) নামক বক্ষঃপরীক্ষার যন্ত্র, রক্তসঞ্চালনের চাপ নির্ণায়ক যন্ত্র এবং অনুবীক্ষণযন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সকল ব্যাধি জীবাণুজাত সেই ব্যাধি নির্ণয়ের জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই প্রস্তাবটি আমাকে সভয়ে করিতে হইতেছে। কেন না যাঁহারা প্রাচীন মতরক্ষার পক্ষপাতী তাঁহারা হয়ত ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন।

বৈদেশিকদিগের উদ্ভাবিত আরও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আছে; কিন্তু অবসরাভাবে এবং আপনাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে আপনাদিগেব নিকট আমার সাগ্রহ নিবেদন এই—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের বিকল অঙ্গসমূহের পরিপোষণের জন্য আমাদের বিগতমৎসর হইয়া ও কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানসম্মত সমুদায় সত্যগ্রহণপদবী নির্ভয়ে অনুসরণ করিয়া উদার মত অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বথা প্রযত্নপর হওয়া উচিত। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশবাসিগণ এইরূপ ক্ষেত্রে লব্ধমহোৎকর্ষ বৈদেশিকদিগের নিকট শিষ্যজনোচিত সারল্যসহকারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা করিতেন। তাহাতে লজ্জাই কি, আর ভয়ই বা কি! মহাজন বলিয়াছেন :—'সর্ব্বতো জয়মন্বিচ্ছেৎ শিষ্যাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।' অর্থাৎ সর্ব্বত্র জয়

ইচ্ছা করিবে, কিন্তু শিষ্যের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করিবে।

এক্ষণে একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সম্প্রতি ডাক্তার কৃষ্ণ স্বামী আয়ার মহোদয় মান্দ্রাজ মেডিকেল কৌন্সিলের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত পরিতাপজনক। মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী জনৈক দয়ালু এবং সদাশয় মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের ডাক্তার আয়ার মহোদয় একজন গভারণর (Governor) ছিলেন। এই অপরাধে 'মান্দ্রাজ মেডিকেল কৌন্সিল' তাঁহার নাম রেজিষ্টারী ভুক্ত ডাক্তার দিগের নাম হইতে কাটিয়া দিয়াছেন। কলিকাতায় রায় ভগবানদাস বগলা বাহাদুরের স্থাপিত এইরূপ একটি ঔষধালয় আছে, এবং তাহাতে এলোপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদীয় দুইটি বিভাগ আছে। ডাক্তার স্যণ্ডার্সের ন্যায় ব্যক্তি এই ঔষধালয়ের অন্যতম গভরর্ণর ছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ও এলোপ্যাথি উভয় বিভাগেরই পরিদর্শক-শস্ত্রচিকিৎসকের কার্য্য (Surgeon-superintendent) তিনিই করিতেন। এক্ষণে ডাক্তার ক্যাডি তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার ক্যাডি আয়ুর্ব্বেদীয় বিভাগের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কি কোন ব্যক্তি কোন কথা বলিতে পারে ?

উন্নতিশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ নির্ব্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা করিয়া কখনই লাভবান্ হইতে পারেন না। প্রকৃত বিজ্ঞানামোদী ব্যক্তি উদারচিত্ত এবং অধিক জানিবার জন্য আগ্রহশীল হইয়া থাকেন। তাঁহার চিত্ত নূতন জ্ঞান-জ্যোতি লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কি বলিতে পারেন যে—তাঁহারা জীব-জগৎ ও উদ্ভিজ্জজগৎ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের ভেষজ-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন ? ইহার উত্তরে তাঁহারা নিশ্চয়ই 'না' বলিতে বাধ্য। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে প্রত্যেক রোগ বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ প্রশমন করিতে পারেন না এই অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নিত্যই লাভ হয়। অপর দিকে বায়ুরোগ, (Nervous disease), পক্ষাঘাত, উন্মাদ, চর্ম্মরোগ, পুরাতন জ্বর, অতিসার, প্রবাহিকা, কুষ্ঠ, মূত্ররোগ প্রভৃতিতে তাঁহারা একেবারেই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল রোগের আবশ্যক শস্ত্রপ্রয়োগব্যাপারে তাঁহারা যে সিদ্ধহস্ত তাহা, মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। যদি প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র এই সকল রোগ প্রতিকারে সমর্থ হইয়া মনুষ্য জাতিকে দুঃখভোগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারে, কাহারও সে সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে না। চিকিৎসার ন্যায় মহৎ বিষয় যাঁহাদের জীবিকা সে সকল ব্যক্তিরত কথাই নাই। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে—কলিকাতা-মহানগরীতে এমন অনেক সুপ্রসিদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন—যাঁহারা বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, যথা—পারদজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মকরধ্বজ, গুলঞ্চ, কালমেঘ, কুড়চি, অশ্বগন্ধা প্রভৃতির সার (Extract) ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আমার ভক্তিভাজন শিক্ষক মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, অনারেবল সার্জ্জেন জেনারেল স্যার পার্ডে লিউকীস্ মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' নামক কারখানায় যেরূপ

প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল দেশীয় ঔষধের সার প্রস্তুত করা হয়, তাহাতেই বুঝা যায় যে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এ সকল ঔষধ কত অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সংপ্রতি 'কিং এডওয়ার্ড মেডিক্যাল স্কুলে'র সংলগ্ন হুকুমচাঁদ লেবরেটারী এবং পাঠাগার উদ্মোচন ব্যাপারে স্যার পার্ডে লিউকীস্ মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"I wish to impress upon you most stongly that you should not run away with the idea that every thing that is good in the way of medicine is contained within the ringfence of Allopathy or Western Medical science. The longer I remain in India and the more I see of the country and the people, the more convinced I am, that many of the empirical methods of treatment adopted by the Vaids and Hakims are of the greatest value, and there is no doubt whatever that their ancestors knew, ages ago, many things which are now-a-days being brought forward as new discoveries; for instance during the last few years, that there has been a cosiderable amount of talk about what is known as 'dechlarination' that is to say, that depriving of the system of salt. This arose from certain experiments carried out by Wival and Javal, as a result of which it is recognised that in all cases of dropsy the greatest benefit can be obtained by restricting your patients to an entirely salt-free dietary. This was known thousands of years ago in the East and Vaid or Hakin could have told you, long before Wival and Javal made their experiments, that salt is contraindicated in all dropsical affections.

অনুবাদ:—"আমি আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে ধারণা করিয়া দিতে চাই যে—ঔষধ সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাল, তাহা এ্যালোপ্যাথি বা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের গোস্পদের মধ্যে আছে,—আপনারা এরূপ মনে করিবেন না যতই অধিক দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও তত্রত্য অধিবাসিগণকে দেখিতেছি আমি ততই বুঝিতেছি যে বৈদ্য ও হাকিমদিগের অভিজ্ঞতামূলক চিকিৎসা বিশেষ মূল্যবান্। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু পূর্ব্বে যাহা জানিতেন, অধুনা সেরূপ অনেক বিষয় নূতন আবিষ্কার বলিয়া ঘোষিত হইতেছে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে—বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ রোগীকে লবণ বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করা সম্বন্ধে অনেক বাগ্বিতণ্ডা চলিতেছিল। ওয়াইভেল এবং জেভেল নামক চিকিৎসকদ্বয় পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে—লবণবিহীন পথ্য দ্বারা শোথরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে এবং তাহাই পূর্ব্বোক্ত বাগ্বিতণ্ডার কারণস্বরূপ হইয়াছিল। ভদ্র মহোদয়গণ, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই তথ্য প্রতীচ্য দেশবাসিগণ অবগত ছিল এবং ওয়াইভেল ও জাভেলের পরীক্ষার বহুপূর্ব্বে যেকোন বৈদ্য বা হাকিম বলিতে পারিত যে—সর্ব্বপ্রকার শোথরোগে লবণ অহিতকর।"

শিশুর উদরাময় চিকিৎসা।

(ঠাকুরমা ও নাতনী)

—:*:—

লীলা। ঠাকুরমা, আমি এসেছি।

ঠাকুরমা। কে লীলা নাকি ?

লী। হাঁ ঠাকুমা, চোখে দেখ্‌তে পাওনা নাকি ?

ঠা। চোখের আর দোষ কি দিদিমণি ? আজ প্রায় একশত বৎসর হতে চল্‌লো প্রভু-ভক্ত ভৃত্যের মত খেটেছে। এখন ওর অবসরের সময় হয়েছে।

লী। সংসারের সব দেখে কি তোমার তৃপ্তি হয়েছে, ঠাকুমা ?

ঠা। হয়েছে বৈকি ভাই। বাল্যকাল হ'তে আকাশের নীলিমা, বনস্থলীর শ্যামিকা পূর্ণচন্দ্রকরালোকিত রজনীর সৌন্দর্য্য দেখে আসছি; তার পর কিশোর বয়সে যখন বিবাহ হ'ল তখন দেখলাম, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য স্বামীর চন্দ্রবদনে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তারপর পুত্র কন্যার আর তোমাদের চাঁদ মুখ দেখলাম। এখন বাহ্যদৃষ্টি আর ভাল লাগে না।

লী। ঠাকুর দাদার জন্যে কি এখনও তোমার মন কেমন করে ঠাকুমা ?

ঠা। কেন করবে দিদিমণি ? নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন বলে তিনি কি আমায় ছেড়ে যেতে পেরেছেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্ব্বদা তাঁকে অন্তরে দেখতে পাচ্ছি। তাই বলছিলাম যে বাহ্যদৃষ্টি আর ভাল লাগে না।

লীলা। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে স্বামীকে না পেলে কি তৃপ্তি হয় দিদিমা ?

ঠা। হয় বৈকি ভাই। যখন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় তখন হয়। জীবনে এমন এক দিন গেছে, যখন স্বামীর একটী চুম্বন পাবার জন্যে ব্যাকুল ভাবে কত রাত জেগে প্রতীক্ষা করে বসে থাকৃতাম, কিন্তু এখন আর চুম্বন আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা নাই, বাহ্য প্রেম চলে গেছে। মরা সোণার খাদ কেটে গিয়েছে। এখন অন্তরে সর্ব্বদা স্বামীকে দেখতে পাই, কিন্তু প্রেমের আকুলতা ব্যাকুলতা নাই—এবে বিরহ শূন্য, ধীর, শান্ত, স্থির প্রেম। এখন আর দৃষ্টি সানুরাগে স্বামীর মুখ পদ্মে বিন্যস্ত হয় না—কেবল তাঁর সর্ব্বতীর্থময় চরণ দুখানির উপর পড়ে থাকে, আর চরণ দুখানি থেকে যে একটা সূক্ষ্ম জ্যোতি নির্গত হয়ে বিশ্বপিতার চরণ ধূলিতে সংযুক্ত হয়েছে, চক্ষু সেই দিকে লোলুপ ভাবে চেয়ে থাকে।

লী। (পদধূলি লইয়া) ঠাকুরমা, আশীর্ব্বাদ কর—যেন তোমার মত পতিভক্তি পাই।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্র। বেশ, পরকালের দিকেই খরদৃষ্টি দেখছি যে ইহকালের কাজটা বুঝি ভুলে গেলে ?

লী। ভয় নেই তোমার। এইবার ইহকালের কথা পাড়ছি। দেখ ঠাকুমা সেবারেতে তোমার দয়ায় ছেলে দুটো রক্ষে পেলে। এবার আবার দুটোর পেটের অসুখ নিয়ে ভুগছি। কিছুতেই ভাল হয় না।

ঠা। কি রকম হয় বল্ দেখি ?

লী। ছোট খোকার রোজই ৬।৭ বার করে পাতলা দাস্ত হয়, রাতেও ২।১ বার হয়। আর বড়খোকার রোজ ৩।৪ বার করে দাস্ত,

কখন পাতলা, কখন ভসকা ভসকা, আবার কখন বাঁধা মলও দেখা যায়।

ঠা। বাহ্যের চেহারা কেমন?

নী। ছোট খোকার হলদে রঙ্গের বাহ্যে হয়, আর বড় খোকার কখন হলদে, কখন মেটে, মেটে কখন শাদাটে, কখন বাঁশাক-ছেঁচানির মত বাহ্যে হয়।

ঠা। ওদের বয়েস কত হয়েছে রে?

নী। ছোট খোকা এই মোটে এক বছরের হল, আর বড় খোকার এই পৌষে আড়াই বছর পূরবে।

ঠা। কি খেতে দিস্?

নী। ডাক্তারে যখন যা বলে, জল বার্লি, বেঞ্জারস্ ফুড্, হরলিকের মলটেড্ মিল্ক—এই সব।

ঠা। দুধ দিস্ না?

নী। না, ডাক্তারে দুধ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। ছোট খোকাকে কখন কখন একটু আধটু দেয়।

ঠা। ছোট খোকা কি মাই খায়?

নী। খেত; ডাক্তারে মাই দিতে বারণ করেছে।

ঠা। কেন?

নী। (নিরুত্তর)।

ঠা। পোয়াতি হয়েছিস বুঝি?

নী। হাঁ।

ঠা। তা হলে মাই দিসনে।

নী। কিন্তু খোকা বড় কাঁদে, এক আধ-বার না দিলে চলে না।

ঠা। তা দিস্, দুধ খুব করে গেলে ফেলে তার পর মাই দিবি। তাও যত কম হয় ততই ভাল।

নী। কেউ কেউ বলে—মাইতে তেতো মাখিয়ে রাখলে আর মাই খাবে না।

ঠা। না তা করিস্ নে। যাদের মাই খাবার বড় ঝোঁক, তাদের ঐ রকম জোর জবরদস্তি করে মাই ছাড়ালে ছেলে একে-বারে মনমরা হয়ে থাকে। আর তাতে করে খুব অসুখও হ'তে পারে। তা না করে যে রকম বল্লাম অম্‌নি করে মাই দিস্।

নী। তার পর কি পথ্যি দেব বল?

ঠা। ছোট খোকার দাঁত উঠেছে কয়টা?

নী। উপরে চারটে নিচে চারটে।

ঠা। ভাত হবার পর থেকে ভাত খেতে দিস্?

নী। না ভাতত দিইনে।

ঠা। অন্যায় করেছিস্। শাস্ত্রে যে ভাত দেয়ার বিধি আছে, তার মানে যে সেই সময় থেকে শিশুকে ভাত খেতে দেওয়া উচিত।

নী। ডাক্তার বলে বার্লি দিলেই হবে।

ঠা। তা বটে, চাল, যব, গম একই জাতের; তবে আমাদের দেশে বহুকাল থেকে যা চলে আসছে, সেটা সয়ও ভাল আর খরচ ও কম হয়, পয়সাগুলোও দেশে থাকে।

নী। তুমি যা বলবে আমি তাই দেব।

ঠা। তা ভাতই দিস্। তবে বার্লি দিলেও ক্ষতি নাই, ওটা দেশে চলে গেছে। তবে বার্লি দিতে হলে ভাল বার্লি দিতে হয়। বাজারে অনেক বার্লিতে চালের গুঁড়ো মিশায়।

নী। আচ্ছা ঠাকমা, তুমিত বল্‌ছ—ভাত দিতে; তবে চালের গুঁড়ো মিশালে ক্ষতি কি?

ঠা। কচি ছেলেদের একটু ভাল পুরাণ চালের ভাত দিতে হয়। ওরা যে চাল দেয় সেটা একেবারে জঘন্য। ভাল চাল দিলে ক্ষতি ছিল না।

নী। কিন্তু দেখ ঠাক্‌মা, তুমিত বল্‌ছ

ভাল চাল দিতে, কিন্তু আমাদের বাড়ীর পাশে আমাদের এক জন পাইক থাকে তারা জাতে পোদ। তার একটী এক বছরের ছেলেকে খুব মোটা রাঙা চালের ভাত দেয়, ছেলেটাও কোঁত কোঁত করে গেলে।

ঠা। তাতো হবেই দিদি! মানুষের যার যেমন অবস্থা, ভগবান্ তাকে তেমনি সয়বার শক্তি দিয়েছেন। শুধু খাওয়া কেন শীতের সময় তোমার খোকাটীকে গরম জামা কাপড়ে সাজিয়েও তোমাদের ভয় হয়—পাছে ঠাণ্ডা লাগে, কিন্তু পোদের সেই ছেলেটী এখনি পাতলা সুতোর কাপড় গায়ে দিয়ে অনায়াসে শীত কাটিয়ে দেয়। ভগবানের এ দয়া না থাকলে কি সৃষ্টি থাকত?

নী। ঠিক কথা ঠাকুমা। এখন ভাত কি করে দেব বল?

ঠা। বল্‌ছি, আগে বার্লির কথা বলি। বার্লি দিতে হলে খুব ভাল বার্লি দিতে হবে। এক রকম আস্ত বার্লি পাওয়া যায়, তাকে 'পার্ল বার্লি' বলে। সেই বার্লি সিদ্ধ করে দিলে খুব ভাল হয়।

নী। আচ্ছা ঠাকমা, বিলিতী বার্লির মত কোন জিনিষ কি আমাদের দেশে নেই?

ঠা। আছে বৈকি ভাই! আমাদের সোণার দেশে নেই কি? দেশে জিনিষ আছে, কিন্তু মানুষ নেই। ঐ শটী বলে যে একরকম গাছ আছে; কতকটা হলুদ গাছের মত আর হলুদের মত জিনিষ তার গোড়ায় হয়, সেই গুলি শুকিয়ে গুড়ো ক'রে বার্লির মত পাক করে খেতে দিলে ছেলেদের পেটের অসুখে খুব উপকার হয়। তা ছাড়া পানফলের পালো আছে একরকম কাঁচকলার গুঁড়ো আছে, আরও কতকি আছে, কে তার সন্ধান করে! যদি কোন জ্ঞানী বড়লোক এই সব জিনিষ থেকে ছেলেদের জন্যে বার্লির মত একটা খাবার তৈয়ের করে, তা হলে অনেক লোক প্রতিপালন হয়, দেশের অনেক পয়সা বেঁচে যায়, আর যে করে তারও অনেক পয়সা হয়।

নী। হাঁ, ভাল কথা ঠাকমা। এরারুট কেমন জিনিষ?

ঠা। এরারুটও ছেলেদের পেটের অসুখে খুব উপকারী। বাহ্যে খুব কমিয়ে দেয়।

নী। তা যাক, সবত শুনে রাখলাম এখন ভাত কি করে দেব বল।

ঠা। বলি শোন ৩।৪—বছরের পুরাণ সরু চাল যোগাড় ক'রে বড় খোকাকে পোরের ভাত করে দিবি।

নী। পোরের ভাত আবার কি ঠাকমা?

ঠা। পোরের ভাত কি তাও জানিস্‌নে তোরা এমনই মেম্ বনে গেছিস্—শোন বলি। যাতে দরকার মত ভাতধরে এমন একটা ছোট ভাঁড় নিবি, আর চালগুলি বেশ করে বেছে ধুয়ে সেই ভাঁড়ে রাখবি, তাতে এমন জল দিবি যেন ফেন না থাকে, অথচ ভাত যেন বেশ সিদ্ধ হয়। তারপর কতকগুলি ঘুঁটে থাকে থাকে সাজিয়ে তাতে আগুণ ধরিয়ে দিবি, আর ভাঁড়টী তার উপর রাখবি। আর কিছুই করতে হবে না। শেষে বেশ সিদ্ধ হয়ে গেলে ভাতগুলি নামিয়ে নিবি।

নী। যদি নিত্য একরকম যোগাড় না হয় ঠাকুমা?

ঠা। যোগাড় হবে না কেন, চেষ্টা থাকলেই যোগাড় হয়। নিতান্ত না হলে মাটীর হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে ভাত সিদ্ধ করে দিস্।

নী। মাছ তরকারী কি দেব?

ঠা। কচি কাঁচকলা আর ছোট কৈ, মাগুর, শিঙ্গি মাছের ঝোল; এছাড়া আর কিছু দিবিনে। তরকারী লঙ্কা কি ঘি দেওয়া হবে না। তাছাড়া যত কম তেলে রাঁধা যায়, ততই ভাল।

লী। তা শুধু এই তরকারী দিয়ে কি খাবে?

ঠা। অসুখ বিসুখ হলে আর উপায় কি! ঐ তরকারী দিয়েই ভুলিয়ে রাখতে হয়।

লী। এতে যদি অরুচি হয়?

ঠা। ছেলেপিলের প্রায়ই অরুচি হয় না। তবে নিতান্ত অরুচি হ'লে এটা সেটা দিতে হবে বৈকি। কিন্তু অন্য জিনিষের কথা বলছি ব'লে যেন গোড়া থেকেই দিস্‌নে। নেহাৎ দরকার বুঝ্‌লে তবে দিবি। অরুচি হ'লে একটু আধটু কুপথ্য দিয়েও রুচি করতে হয়।

লী। না তা দেব কেন। যদি নেহাৎ রাখতে না পারি, কি অরুচি হয়, দেখি তাহ-লেই দেব।

ঠা। হাঁ তাই করিস্ মসুর কি অড়হর দালের যুষ একটু আধটু দেওয়া চলে। কিন্তু কেবল যুষ একটা দাল যেন না থাকে। আর দালে মসলা যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। কেবল একটু নুন, হলুদ আর ধনে বাটা। তাই দিয়ে সিদ্ধ করে কাপড়ে ছেঁকে দিবি। তেল ঘির নামও নয়।

লী। আর তরকারী কি দেব?

ঠা। তরকারী আর কিছু না দেওয়াই ভাল, দিলে কুপথ্যি দেওয়াই হ'ল। তবে নেহাত দরকার হ'লে কোন দিন দুটো পল্‌তা বেগুণ সিদ্ধ করে দিলি। কোন দিন বা বেগুণ, কাচকলা আর কচি পটোলের তরকারী করে, কি ঐ সব তরকারী দিয়ে একটু গাঁদালের ঝোল ক'রে দিবি।

লী। গাঁদালের ঝোল কি ঠাকুমা?

ঠা। তোদের জ্বালায় জ্বালাতন বাপু। গাঁদালের ঝোল কি তাও জানিসনে! গাঁদাল এক রকম লতানে গাছ। কোন কোন দেশে গন্ধভাদুলেও বলে। তারি পাতার সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে ঝোল করলেই গাঁদালের ঝোল হ'ল।

লী। তরকারী আর কিছু নয় ত?

ঠা। না, তরকারী আর কিছু নয়। আর ঐ সব তরকারী যদি না খেয়ে চুষে ফেলে দেয়, তা হলে খুব ভাল হয়। হাঁ একটা কথা। ছাখ,—ভাতের সঙ্গে পাতি কি কাগ্‌জি লেবুর রস দিতে পারিস্। তাতে অরুচিও যায়, আর পেট ঠাণ্ডাও হয়।

লী। আচ্ছা, তরকারী ত হ'ল; এখন জলখাবার কি দেব বল?

ঠা। দাড়িম, বেদানা, পানফল, কেশুর সিঙ্গাপুরে কেশুর, কচি বেলপোড়া, পাকা গাব, বিলীতি গাব—যে গুলোকে 'ম্যাঙ্গোষ্টিন' বলে,—এই সব জিনিষ জলখাবার দিবি। তবে কেশুর টেশুরগুলো চিবিয়ে রস খেয়ে ছিব্‌ড়ে ফেলে দেওয়াই ভাল।

লী। অনেকে বেলের মোরব্বা দিতে বলে ঠাকুমা।

ঠা। আরে ওগুলো কিছুই নয়। বেলের মোরব্বা তৈয়ের কতে হ'লে বেল খণ্ড খণ্ড করে কেটে সিদ্ধ করে, তাতে আসল জিনি-ষটে বেরিয়ে যায়, থাকে কেবল ছিব্‌ড়েগুলো আর তার মধ্যে চিনির রস ভরে রাখে, ওর চেয়ে বেলপোড়া অনেক ভাল; আহার ওষুধ দুই হয়। তবে বেলপোড়ার সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে দিলে ছেলেরা বেশ আনন্দে

খায়। আর একটা মনে রাখিস্ যে বেল যত কচি হয় ততই উপকারী।

লী। আচ্ছা, জলখাবার ত হ'ল। এইবার দুধের কথা বল।

ঠা। বাড়ীতে গরু করেছিস্ ত ?

লী। হাঁ, সে আর বলতে। শুধু তাই নয় ঠাকুমা, গরু করে শ্বশুর বাড়ী আমার কত সুখ্যাত হয়েছে।

ঠা। কিরকম বল দেখি।

লী। আমার শ্বশুরেরা বড় গৃহস্থ, তাত জান ঠাকুমা। কোন তরকারীর খোলা, পাতের ভাত, এসব আগে ফেলা যেত। এখন সে সব গরুতে খায়, একটু কিছু ফেলা যায় না। বাগান থেকে রোজ দুজন মালি আসে, আমি তাদের ঘাস আনতে বলে দিয়েছি। তারা রোজ দুবোঝা করে ঘাস নিয়ে আসে। আর কিছু খড়, খোল ও দানা কিনতে হয়।

ঠা। কতগুলি গরু হয়েছে ?

লী। গরু মোট ছ'টা। তিন তিনটের দুধ এক একবারে পাওয়া যায়। কাজেই বারমাস রোজ প্রায় ২০।২৫ সের করে দুধ হয়।

ঠা। তা হ'লে সংসারে একটা কাজ করেছিস্ বল।

লী। শোন না ঠাকমা, আগে দুধের জন্যে মাসে প্রায় দুশো টাকার কাছাকাছি খরচ হ'ত। এখন একশ টাকার বেশী হয় না।

ঠা। শুনে বড় আহ্লাদ হল লীলা। এই রকম গিন্নিপনাই ত চাই।

লী। আগে সব শোন। অনেক দুধ হচ্ছে দেখে যে দুধ খরচ হয়, তা বাদে যা থাকে, তাই নিয়ে আমি নানা রকম খাবার তৈয়ের করি। ছানা, ক্ষীর, সন্দেশ, ক্ষীরের পান্তুয়া, রাবড়ি, মাখন, ঘি,—এই সব। শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, দেওর—এঁরা সেই সব খেয়ে বলেন—আর আমরা বাজারের খাবার খাবনা, বৌমার হাতের খাবার খাব। তা অত বড় সংসার ঠাকুমা, যাঁকে একদিন কিছু না দিতে পারি, তিনি সেই দিন রাগ করেন। শ্বশুর বলেন, বৌমাকে বল—আরও ছ'টা গরু পুষতে। কিন্তু বড় খাটতে হয় ঠাকুমা।

ঠা। এইত চাই দিদিমণি। সংসার কর্ম্ম-ক্ষেত্র। এ সংসারে যিনি না খেটে জীবন কাটিয়ে দিতে চান্, তিনিত জেতেন না,—হারেন, সংসারে আত্মীয়স্বজনদের—ছেলে, নাতি, জামাই, গুরুজনদের—স্বামী, শ্বশুর, ভাসুরদের যদি সুখী করতে না পারলাম, তবে এ মেয়ে-মানুষজন্ম বৃথায় গেল। তবে একটা কথা বলি দিদিমণি,—সংসারের ঝি চাকরদেরও একটু যত্ন করিস্। আমি যখন এবাড়ীতে আসি, তখন এদের এত বোল বলা ছিল না। রাম-প্রসাদ ব'লে একটা চাকর ছিল। তখন আমার দিদিমা বেঁচে। কোন ভাল খাবার এলে যখন তাঁরে দেওয়া হত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন—"রামপ্রসাদকে দেওয়া হয়েছে ?" রামপ্রসাদকে না দিলে তিনি খেতেন না।

লী। ঠাকুমা, সে কথা বলতে হবে না। আমি কার নাতনী, সে কথা জান। সপ্তায় একদিন আমি খাবার দুভাগ করি। এক ভাগ বাবুদের জন্যে, আর একভাগ চাকরদের জন্যে। আর চাকর চাকরাণী কবে সেই দিন আসবে বলে হাঁ করে থাকে।

ঠা। শুনে বড় সুখী হলাম্ লীলা। আশীর্ব্বাদ করি—তুই সকলকে এমনি সুখী ক'রে নিজে চিরসুখী হয়ে পাকা মাথায় সিঁদুর পরিস্।

প্র। ঠাকুমা, এতক্ষণ মুখটী বুজে বসে আছি, কিন্তু এবার আর পাল্লেম না। তোমার নাত্নী সকলকে সুখী করেছেন বটে, কিন্তু আমাকে যে নিতান্ত অসুখী ক'রে তুলেছেন। সে দিকে কি তোমার একটু কৃপাদৃষ্টি পড়বে না ঠাকুমা?

ঠা। কেন ভাই, লীলা তোমায় কি অসুখী করেছে?

প্র। অসুখী নয় ঠাকুমা। সকালে ঘুম ভেঙ্গে লীলাকে খুঁজি, কোথায় লীলা। দুদিকে কেবল দুটো বালিষ। লীলা তখন গোয়ালঘর তদারক করছে। একটু বেলা হ'লে ভাবি—লীলা আস্চে, কোথায় লীলা। সে সংসারের একাজ সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। খাওয়ার সময় শুধু একবার তাকে দেখ্তে পাই। তার পর আর নয়। গভীর রাত্রে যখন সংসারের সকলে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন লীলা খাবার নিয়ে আমার কাছে আসে। যাকে সর্ব্বদা দেখ্তে চাই, তাকে এত কম দেখ্তে পাওয়া কি একটা বিষম কষ্ট নয় ঠাকুমা?

ঠা। এতে কি তোর কষ্ট হয় প্রফুল্ল! সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যরূপিণী এমন স্ত্রী পেয়েছিস্ এত ভাগ্যের কথা, এতে দুঃখ কেন ভাই? আজকাল যে রকম দিন কাল পড়েছে, তাতে লোকে তাই চায়। সংসারের কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে, পাড়া প্রতিবাসীর খোঁজ খবর না নিয়ে স্ত্রী শুধু সর্ব্বদা আমার কাছে থাকে,—এই এখন লোকে চায়। কিন্তু সেটাও আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্ম নয়, অধর্ম্ম বলেই কথিত হয়েছে। স্ত্রী আমার সংসারের সকলকে সুখী করছে, স্ত্রী আমার সংসার মাথায় করে রেখেছে, স্ত্রী আমার পরমপ্রিয় পতি-পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে সংসারের সকলের সুখের জন্যে খাট্ছে; এতে কি তোমার দুঃখ হয় ভাই?

প্র। ঠাকুমা, আজ তোমার পা ছুঁয়ে প্রাণের একটা সত্য কথা বলছি। যখন প্রথম এম, এ, পাস ক'রে জগতটাকে দেখেছিলাম, তখন তাই মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম যে—আমি আর স্ত্রী পুত্র এই নিয়েই সংসার, কিন্তু তোমার আর তোমার চেলা নাত্নীর ব্যবহার দেখে সে মত বদ্লে, গিয়েছে। সকালে উঠে যখন লীলাকে কাছে পাইনে, তখন চুপি চুপি গোয়ালে গিয়ে দেখি—লীলা আমার গরুর শুশ্রূষা করছে। যখন দুপুর বেলা লীলাকে পাইনে তখন লুকিয়ে গিয়ে দেখি লীলা আমার পিতামাতার শুশ্রূষা করছে। যখন বিকালে লীলাকে পাইনে, তখন চুরি করে লুকিয়ে গিয়ে দেখি—লীলা আমার দাস দাসী অতিথি অভ্যাগতদের অভিযোগ শুন্ছে। দেখে আমার কি মনে হয় ঠাকুমা,—তা আমি প্রকাশ ক'রে বল্তে পারিনে। আর মনে হয় লীলা নিজে লীলা হয়নি, লীলাকে লীলা করেছেন তাঁর ঠাকুমা। তখন তোমার ঐ চরণদুখানির উদ্দেশে আমার মস্তক স্বতই অবনত হয়ে পড়ে ঠাকুমা। প্রার্থনা করি—যেন জন্ম জন্মান্তরে লীলার মত কর্ত্তব্যরূপিণী স্ত্রী পাই।

লী। নাও, আর বক্তৃতা করতে হবে না। তোমার শ্রীচরণের দাসী লীলা, তাকে অত বড় করা কেন? ওচরণে যে কত অপরাধ করি, তার কি সীমা আছে?

প্র। অপরাধ—অপরাধ অসংখ্য। প্রথম অপরাধ যে—আমায় সুখী করেছ। দ্বিতীয় অপরাধ যে আমার বাপমাকে সুখী করেছ। তৃতীয় অপরাধ যে আমার ভাইদের সুখী করেছ। চতুর্থ অপরাধে যে সংসারের দাস

দাসী অতিথি অভ্যাগতদের সুখী করেছ। এ অপরাধের শাস্তি কি লীলা?

লী। থাক এখন। অপরাধের শাস্তি যথাসময়ে দিও। এখন আমার কাজের কথা বলতে দাও।

ঠা। কি মিট্‌লো তোদের?

লী। হাঁ ঠাকুমা মিটেছে, এখন দুধ দেবার কি বল?

ঠা। বড় খোকার কতটুকু ক'রে দুধ খাওয়া অভ্যাস?

লী। যখন ভাল ছিল, তখন পাঁচ পোয়া দেড় সের দুধ খেত।

ঠা। তা হলে এখন দেড়পো কি আধ-সের দুধ দিবি। যত দুধ তত জল, আর ৮।১০ টা মুথো থেঁতো করে একসঙ্গে সিদ্ধ করবি। যখন জল মরে যাবে কেবল দুধ থাকবে, তখন নামিয়ে নিবি।

লী। দুধ কি শুধু চুমুক দিয়ে খেতে দেব?

ঠা। পেটের অসুখে শুধু দুধ প্রায় সহ্য হয় না, তবে সহ্য হ'লে দেওয়া যেতে পারে।

লী। সহ্য হচ্চে কিনা কি করে বুঝব?

ঠা। ছেলের মলের দিকে নজর রাখলেই তা বোঝা যায়। যদি মলে শাদা শাদা ছানার মত জমাট দুধ দেখা যায়, তা হলে বুঝ্‌তে হবে যে দুধ হজম হচ্চে না।

লী। তা হলে কি করব?

ঠা। তা হলে শুধু দুধ না দিয়ে একটু ভাতের সঙ্গে, একটু বার্লির সঙ্গে দিবি। আর মলের দিকে নজর রাখ্‌বি।

লী। তাতেও যদি মলের সঙ্গে ছানা ছানা দুধ দেখা যায়?

ঠা। তা হ'লে ঐ রকম সিদ্ধ করা দুধ আর দুধের সিকি আন্দাজ চুনের জল এক সঙ্গে মিশিয়ে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু করে খেতে দিবি।

লী। তাতেও যদি হজম না হয়?

ঠা। তা হলে দুধ কমাতে হবে। আর গরুর দুধ বন্ধ ক'রে ছাগলের দুধ দিতে হবে।

লী। ছাগল দুধ কি করে দেব?

ঠা। যেমন ক'রে গরুর দুধ দিতে বল্‌লাম, তেমনি করে দিবি। ছাগলদুধ পেটের অসুখের পক্ষে বড় উপকারী। যদি পাওয়া যায় তাহ'লে গরুর দুধ না দিয়ে এখন থেকেই দিস্‌।

লী। তাতেও যদি মলের সঙ্গে সেই রকম জমাট দুধ দেখা যায়?

ঠা। তা হ'বে মুতোর সঙ্গে সিদ্ধ করা ছাগল দুধই হজম করতে পারবে। তবে যদিই হজম না হয়, তা হলে দুধ কমিয়ে যতটুকু হজম হয়, ততটুকু দিতে হবে।

প্র। আমি একটা কথা বলে নিই ঠাকুমা। ডাক্তারেরা একটা জিনিষ বার করেছে, তার নাম হচ্ছে পেপটোনাইজিং পাউডার। এক-রকম গুঁড়ো। তার সঙ্গে দুধ তৈয়ার করে দিলে খুব সহজে হজম হয়। দরকার বুঝলে সেটা দিতে কি আপত্তি আছে?

ঠা। না তাতে আপত্তি কি। জিনিষটে যদি সত্যই উপকারী হয়, কেন ব্যবহার করব না? তবে কথা হচ্ছে এই যে—দেখতে হবে—জিনিষটে প্রকৃত উপকারী কিনা। আবার এক দিকে উপকার ক'রে অন্য বিষয়ে অপকার করে কি না সেটাও দেখা দরকার।

প্র। না ঠাকুমা, জিনিষটা খুব উপকারী তবে পরিণামে কোন অপকার করে কি না তা জানি না।

ঠা। তবেই ত কেমন করে দিতে বলি। ওগুলা না হলে কি চলে না?

প্র। আর একটা কথা বলছিলাম ঠাক্‌মা—ডাক্তারেরা কতকগুলি ছেলেদের খাবার তৈয়ার করেছেন, সেগুলি পেটের খাবার যেমন হজম হয় সেই রকম উপায়ে আগেই কত-কটা হজম করা হয়। সেগুলি ছেলেরা খুব সহজে হজম করতে পারে। আর তার মধ্যে বেনজারস ফুড্ (Benger's food) বলে যে একটা খাবার আছে, সেটা ছেলেদের পেটের অসুখে খুব উপকারী।

ঠা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার কথা জানি বটে। ঐ যে কলকাতার কুমারটুলীতে একজন খুব বড় আর খুব ভাল কবিরাজ ছিলেন, তাঁর নামটা কি ?

প্র। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন।

ঠা। হ্যাঁ, ঐ নামই বটে। তিনিই এক বার আমাদের বাড়ী এসে ঐ খাবার আর ছাগলদুধ পথ্যি দিয়েছিলেন। তাতে খুব উপকারও হয়েছিল। তবে উহাতে ক্ষেত্রবিশেষে উপকার হলেও দেশের পক্ষে খাদ্য বলে ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না।

লী। সেই ছোট বৌয়ের খোকার পেটের অসুখের সময় ঠাক্‌মা, আমারও মনে আছে। অমন কবিরাজ কিন্তু আর দেখিনি ঠাক্‌মা। তিনি মানুষ নন, দেবতা ছিলেন।

ঠা। দেখ, বিলাতি ফুড বা দুধ এদেশের ছেলেদের খাদ্য হয় এটা আমার ভাল বোধ হয় না—এদেশে কত উপকারী থাবার আছে। খুব দরকার হলে ওষুদ বলে দিতে হয়, খাবার করে নিওনা। দেশের জিনিষে চললে আর বিদেশের জিনিষ ব্যবহার করা কেন ?

প্র। হ্যাঁ, সেত বটেই। আর কবিরাজ-মহাশয়ও তাই করতেন।

লী। ভাল কথা ঠাক্‌মা। আজকাল বিস্কুটের খুব চলন হয়েছে। এরারুটের বিস্কু-টের এক আধখানা দেওয়া যায় ?

ঠা। পারত পক্ষে নয়। তবে যেখানে নেহাৎ অন্য জিনিষ পাওয়া যায় না, সেখানে ছেলে ভোলাবার জন্যে খুব ভাল বিস্কুট এক আধ খানা দেওয়া যায়। তবে আবার বিলিতী টীনের বিস্কুটের চেয়ে শাদা বাতাসার মত হাল্কা যে একরকম দেশী বিস্কুট পাওয়া যায়, সেগুলো টাট্‌কা হ'লে শীঘ্র হজম হয়।

লী। দুধের কথাত হল। এখন আর কি করবো বল ?

ঠা। দুধের কথা হয়েছে, এখনও ঘোল আর ছানার জলের কথা বাকী আছে। যখন দুধ কোন মতেই হজম হয় না, কি খুব সামান্য একটু হজম হয়, তখন টাটকা দইয়ের সঙ্গে ঘোল দিলে আহার ওষুদ দুই হয়। ঘোল নানা রকম আছে। তার মধ্যে যত খানি দই তার সিকি জল মিশিয়ে মইলে যে ঘোল হয় সেইটেই দেওয়া ভাল। যে দইয়ে ঘোল হবে, সেই দই যেন খুব টক না হয়, কি একেবারে টক নয়, এমন না হয়। আর ঘোল থেকে বেশ ক'রে মাখন তুলে ছেঁকে তবে দিতে হয়।

লী। ঘোল কি সইবে ঠাক্‌মা, সর্দ্দি হবে না ?

ঠা। অনেকের সইতে পারে, আবার অনেকের সয় না। না সইলে কি একটু আধটু সর্দ্দি কাসি থাকলেও যদি ঘোল দেবার দর-কার হয়, তা হ'লে একটা মাটীর হাঁড়িতে গোটা কতক জীরে ভেজে তার ওপর ঘোল ঢেলে দিবি, আর একটু ফুটে উঠলে নামিয়ে ছেঁকে কুসুম কুসুম গরম থাক্‌তে খাওয়াবি।

কর্কট-রহস্য।

—:*:—

'মর্কটেতে কি জানিবে কর্কটের রস।
ভাগ্য যার ভাল, সেই খেয়ে গায় যশ॥
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজ কাব্য-মধ্যে স্থান দিয়া যে কাঁকড়াকে 'অমরত্ব' দান করিয়াছেন, আজ আমি সেই কাঁকড়ার গুণ কীর্ত্তন করিব। মাঘের দুরন্ত হিমে, অলাবু-সুহৃদ্ কর্কটের প্রসঙ্গ যাঁহার ভাল লাগিবে না, কাঙ্গালের কর্কট রাশি ভাবিয়া তিনি আমায় ক্ষমা করিলে কৃতার্থ হইব।

কাঁকড়া সকলেই দেখিয়াছেন, সুতরাং কাঁকড়া যে কি পদার্থ, বোধ হয় তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু কাঁকড়া সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠকের জানিবার আছে। কাঁকড়া অনেক রোগে উপকারী, এবং রোগ-উৎপাদনের শক্তিও কাঁকড়ার আছে। সেই সকল কথার আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কাঁকড়া পঁচিশ প্রকার। ইহার মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, কতকগুলি জলচর, আবার কতকগুলি বা উভচর। প্রাণিজগতে এপর্য্যন্ত একদল জলকর্কট আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা জলে বাস করে বটে, কিন্তু হিমসমুদ্রে থাকিতে ভাল বাসেনা। উষ্ণ কটিবন্ধনের দিকেই প্রচুর কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র ব্যতীত খাল বিল নদীতেও কাঁকড়ারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; কখন কখন নদীতীরের সিকতাময় শুষ্ক চরে ইহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। স্থল-কর্কট শুষ্কভূমিতে থাকে, ইহাদিগকে জলে ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এইজাতীয় কর্কট সমস্ত দিন গর্ত্তের ভিতর লুকাইয়া থাকে, সন্ধ্যা হইলেই বিষয়কর্ম্মে অর্থাৎ আহার-অন্বেষণে বহির্গত হয়।

কাঁকড়ার শ্বাসযন্ত্র শরীরের মধ্যস্থলে স্থাপিত, দেখিতে ঠিক ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলির মত। এই শ্বাসযন্ত্রটিকে সর্ব্বদাই ইহারা সিক্ত করিয়া রাখে, শ্বাসযন্ত্র শুকাইলে কাঁকড়া বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কাঁকড়ার ভ্রমণশক্তি অতি অদ্ভুত, খাদ্য-সংগ্রহের জন্য ইহারা প্রত্যহ ৩০।৪০ মাইল পর্য্যন্ত অনায়াসে বেড়াইতে পারে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ইহারা শ্বাসযন্ত্রটী ভাল করিয়া ভিজাইয়া লয়, ইহাতে রৌদ্রের প্রখর তাপে পথ চলিবার সময়, ইহাদের কোনই কষ্ট হয় না।

এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে, তাহাদের একটী মাত্র দাড়া, দাড়াটী শরীরের চতুর্গুণ বৃহৎ। এই শ্রেণীর কাঁকড়া যখন পথে ভ্রমণ করে, তখন দাড়াটী সোজা করিয়া রাখে। ইহারা যখন গর্ত্তের মধ্যে থাকে, তখন ঐ দাড়াটী গর্ত্তের দ্বারদেশে আগড়ের মত করিয়া রাখে। এইরূপ অবরুদ্ধ গহ্বরে, আর কোনও জীব সহসা প্রবেশ করিতে পারে না।

আর এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে, তাহারা কেবল নারিকেলের শস্য খাইয়া জীবনধারণ করে। নারিকেলের লোভে ইহারা বড় বড় গাছে উঠে। দাড়া দিয়া নারিকেলের সুকঠিন বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ফলমধ্যস্থিত শস্য বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। ইহাদের দাড়া ঠিক সাঁড়াশির মত। এই দাড়া দিয়া ইহারা প্রথমে নারিকেলের ছোব্ড়া ছাড়ায়,

তাহার পর যেস্থানে নারিকেলের তিনটি চোখ আছে, সেইস্থানে সজোরে আঘাত করে। এইরূপে ঐ স্থানে ছিদ্র করিয়া শাঁসটুকু নিঃশেষে ভক্ষণ করে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ আদর করিয়া ইহাদের নাম রাখিলেন "ভোজন-বিলাসী।" ইহারা শুধু "ভোজনবিলাসী" নয়, শয্যা-বিলাসীও বটে! কেননা ইহারা যে গর্ত্তে বাস করে, নারিকেলের ছোব্‌ড়া দিয়া তাহারই মধ্যে বিশ্রামের জন্য সুখ-শয্যা রচনা করিয়া থাকে। নারিকেলভোজী কাঁকড়া খাইতে বড় সুস্বাদু। এই জাতীয় কাঁকড়ার গাত্র হইতে প্রায় এক কোয়ার্ট তৈল বাহির হইয়া থাকে। একজন জাহাজের অধ্যক্ষ এই কাঁকড়া স্বদেশে আনিবার জন্য একটী ডবল টিনের পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া দিলেন, অধিকন্তু উক্ত পেটিকাটী লৌহনির্ম্মিত তার দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রির মধ্যেই কাঁকড়াগুলি টিনের বাক্সের গাত্রে ছিদ্র করিয়া কারামুক্ত হইয়াছিল। পাঠক মহাশয়! ইহাতেই বুঝুন—ইহাদের দাড়া কতদূর শক্তিশালী!

কাঁকড়া অত্যন্ত কলহপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। যুদ্ধে যিনি জয়ী হন, তিনি পরাজিত শত্রুর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। ইহারই নাম—"শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।" ইহারা চাণক্যের কৌটিল্য-নীতির পরম ভক্ত।

আর এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে,—ইহাদের সম্মুখভাগ কঠিন আবরণে আবৃত, কিন্তু পশ্চাৎদিকে একেবারেই অনাবৃত। ইহাদের একটী লাঙ্গূল আছে। ইহারা অকর্ম্মণ্য জীব—না পারে জলে নামিতে, না পারে মাটীতে দৌড়াইতে; কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। সমুদ্রতীরে অনেক শম্বূকের খোলা পড়িয়া থাকে, সেই খোলার সাহায্যে পশ্চাদ্‌দিক আবৃত করিয়া ইহারা আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা নিবারণও করিয়া থাকে। মৃত শম্বূক না পাইলে, অনেক সময় ইহারা জীবিত শম্বূককে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। ইহাতে 'অন্ন বস্ত্র' উভয়ই সংগৃহীত হয়। জীব-জগতে এই জাতীয় কাঁকড়ার নাম "তপস্বী কাঁকড়া"; "তপস্বীই" বটে, কিন্তু "ভণ্ড-তপস্বী"! কারণ শম্বূককুলসংহার—ইহাদের জীবনের মহাব্রত!

উড়িষ্যা অঞ্চলের সমুদ্রকূলে পাঁচ ছয় রকম কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় কাঁকড়ার বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত, যেন—টক্‌টকে জবা-ফুল! মানব-হস্তের কঠিন স্পর্শে ইহারা মরিয়া যায়, তখন আর দেহের বর্ণ রাঙ্গা থাকে না, কালীর মত কালো হইয়া যায়। তদ্দেশীয় ধীবরগণ—সর্দ্দী কাশি হইলে, এই কাঁকড়া ছেঁচিয়া রস খায়। তাহাদের বিশ্বাস—কাশির এমন চমৎকার ঔষধ জগতে নাই। 'চাঁদীপুরে' কাঁকড়ার রস খাইয়া এক ধীবরপুত্রকে আমি কঠিন কাস-রোগ হইতে মুক্তি লাভ করাইয়াছি। দুর্গন্ধি 'কড্‌লিভার, খাইতে যাঁহাদের আপত্তি নাই, তাঁহারা একবার লাল কাঁকড়ার রস খাইয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস—যথেষ্ট উপকার পাইবেন। বালেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে 'চাঁদীপুরে'র' সমুদ্রতীরে আমি এই শ্রেণী কাঁকড়া অসংখ্য দেখিয়াছি। সামান্য প্রয়াসেই ইহারা মানুষের হাতে ধরা পড়ে।

মালোবার উপকূলে এক রকম কাঁকড়া আছে, ইহাদের আকার তেঁতুলে বিছার মত। ইহারা মানুষ কি কোনও জীবজন্তু দেখিতে

পাইলে ছুটিয়া গিয়া কামড়ায়। এই জাতীয় স্ত্রী কাঁকড়াগুলি সম্ভোগান্তে স্বামী হত্যা করিয়া থাকে। তাহার পর নিজের সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া পরম তৃপ্তিপূর্ব্বক মৃত স্বামীর দেহ ভক্ষণ করে। ইহারা কেবল বংশ-রক্ষার জন্যই স্বামীর জীবিত থাকা প্রয়োজন মনে করে। বলা বাহুল্য—এইজাতীয় কাঁকড়ার পুরুষগণ —স্ত্রী জাতির অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণয়িনীর মন ভুলাইবার জন্য বিধাতা ইহাদিগকে স্ত্রী জাতির চেয়ে রূপবান্ করিয়াছেন। ইহাদের ভাগ্যে প্রাণের পরিবর্ত্তে—প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

জীবপ্রবাহরক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষের মিলন —ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু কর্কট-জাতির যৌন সম্মিলন, জননপ্রক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কর্কট পিতা বা কর্কটী মাতা কেহই অপত্যলালনের ভার গ্রহণ করে না। জননপ্রক্রিয়ায় পিতার এবং প্রসবপ্রক্রিয়ায় মাতার করণীয়ের অবসান হয়। কর্কট শিশু দৈবাধীন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, দৈবাধীন রক্ষা পায়। (কর্কটদম্পতির প্রেমের স্থায়িত্ব, ইহাদের জাতীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অনেক কাঁকড়াই কিছুতেই প্রণয়িনীর মন পায় না। প্রণয় নিবেদন করিতে গেলে ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হাতাহাতি হয়। অনেকে আবার প্রেয়সীর অনুরাগ বিরাগ বুঝিতে না পারিয়া, সাধ্য সাধনা করিতে গিয়া প্রাণ হারায়। প্রেম-চুম্বনের ছলে প্রেয়সী, প্রেমিকের মাংস ভক্ষণ করে।)

যে জাতীয় কাঁকড়া বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার নাম "বায়লেট"। কাঁকড়ার মধ্যে ইহারাই কুলীন। ইহাদের এক এক জনের ভাগ্যে বহু স্ত্রীলাভ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের পুরুষেরা বলবান্, তাহারা স্ত্রীকে ভালও বাসে, স্ত্রীও স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে ভালবাসায় 'জেলাসি' বুঝিতে পারা যায়;—একে অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রেম সম্ভাষণ করিতে সাহস করে না।

বায়লেটের বংশ অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গর্ভবতী কর্কটী প্রসব করিবার জন্য সমুদ্রাভিমুখে বা নদী-তীরে গমন করে, প্রসবান্তে আর ফিরিয়া আসে না। অধিকাংশ কাঁকড়াই প্রসবের পর মরিয়া যায়। কর্কট শিশু "মাতৃহন্তারক" বলিয়া অনেক হিন্দু কাঁকড়া খায় না।

এক একটী কর্কটী অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি দেখিতে কিম্ভুত কিমাকার, মাথাটী শিরস্ত্রাণের ন্যায়, সেই মাথায়— একখানি কুঠার;—তাহারই নিম্নে একজোড়া উজ্জ্বল চক্ষু। এই অল্পাবস্থাতেই ইহারা জলে সাঁতার দিতে থাকে। অল্পদিন পরেই এই সকল ডিম্ব অতি ক্ষুদ্র কাঁকড়ার আকার ধারণ করে। তখন আর জলে থাকেনা, সমুদ্রের তীরে উঠিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। একটু বড় হইলে, পিতৃ-মাতৃ-উদ্দেশে যাত্রা করে। এই সময়ই ইহাদের বিপদ,—পক্ষীরদল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া কর্কটশিশুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা পক্ষিকুলের লুব্ধ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাই ফিরিয়া গিয়া বাপ-মাকে দেখিতে পায়।

এস্থলে অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন, যে - কর্কটশিশুরা ত জন্মিয়া পিতামাতাকে দেখিতে পায় না, মা বলিয়া সোহাগ যত্নেও লালিত হয় না, তবে তাহারা কেমন করিয়া জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীকে চিনিতে পারে, তাহাদের বাস-স্থানেরই বা কি করিয়া সন্ধান

পায় ? প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার উত্তরে বলেন —স্বাভাবিক সংস্কারই কর্কটশিশুর পথ প্রদর্শক, স্বাভাবিক সংস্কার বলেই তাহারা পিতা মাতাকে চিনিতে পারে।

কাঁকড়ারা দলবদ্ধ হইয়া যখন সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হয়, তখন একরকম শব্দ করিতে থাকে। সেশব্দ দুই মাইল দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। দূর হইতে এই কর্কট-অভিযান দেখিলে মনে হয়, যেন এক বিরাট বীরবহিনী রণযাত্রায় বহির্গত হইয়াছে। অভিযান প্রায় রাত্রিকালেই হইয়া থাকে। বলবান্ কর্কটগণ—পথ প্রদর্শকের কার্য্য করে। ইহাদের পশ্চাতেই -মন্থরগামিনী গর্ভবতীর দল। বৃদ্ধ শিশু ও দুর্ব্বল কর্কটগণ সকলের শেষে স্থান পায়। পথ চলিবার সময়—কর্কট-বাহিনী কোন বাধাই গ্রাহ্য করে না। সম্মুখে কোন মানুষ বা পশু দেখিলে দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া ভয় দেখায়, কখন কখন সকলে মিলিয়া শত্রুকে আক্রমণও করিয়া থাকে। কর্কট-বাহিনী ঠিক লম্বাভাবে অগ্রসর হয়, বামে বা দক্ষিণে হেলে না। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া ইহারা প্রথমেই একবার অবগাহন স্নান করিয়া লয়। তাহার পর গর্ভিনীগণ অণ্ড প্রসব করে, পুংজাতীয় কর্কটগণ স্থানান্তরে গিয়া খোলস ছাড়ে। এই সময় ইহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, প্রায় পক্ষ কাল পরে, নূতন খোলস জন্মিলে তবে আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। এই সময়েই ইহারা মনুষ্যকর্ত্তৃক ধৃত হয়।

এই বার কাঁকড়ায় রোগনাশিনী শক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যাঁহাদের হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল কাঁকড়া তাঁহাদের পক্ষে বড়ই উপকারী। যক্ষ্মা রোগে—কর্কট একটী সুপথ্য কিন্তু উদরাময়, শোথ, মেহ, উপদংশ, অজীর্ণ (ডিস্‌পেপসিয়া), উদরী, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, অর্শ, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ, প্রদর, বহুমূত্র, মূর্চ্ছা এবং বাতরোগে কাঁকড়া-ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ।

শিশু (১০ বৎসর বয়সপর্য্যন্ত) এবং গর্ভিণীর পক্ষে কাঁকড়া অত্যন্ত অহিতকারী।

মস্তিষ্ক-রোগে বধিরতায় এবং শুক্র-তারল্যে কাঁকড়া ঔষধির কার্য্য করিয়া থাকে।

যেসকল পুরুষের সন্তান হয় না এবং যেসকল রমণী পুনঃ পুনঃ কন্যা প্রসব করেন, কর্কট-ভোজনে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে।

কর্কটের অস্থির সূক্ষ্ম চূর্ণ মাখন সহ চাটিয়া খাইলে, রক্তপিত্তজনিত রক্ত-বমন তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

কাঁকড়ার দাড়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া চরণতলে প্রলেপ দিলে, ছেলেদের শয্যামূত্র-রোগ ও দাঁত-কড়-মড়ানি ভাল হয়। নিজ দেহেই ইহা আমি পরীক্ষার সুযোগ পাইয়া ছিলাম।

যে দিন কাঁকড়া ভক্ষণ করিবেন, সে দিন মূলা, দুগ্ধ, ডিম্ব এবং কোনও প্রকার দাল খাইবেন না। শাস্ত্র-মতে এগুলি কাঁকড়ার পক্ষে সংযোগবিরুদ্ধ।

অলাবুযুক্ত কর্কট যে কেবল মুখপ্রিয় তাহা নহে, উপকারীও বটে, কাঁকড়া পেট গরম করে—অলাবু কাঁকড়ার এই গুরুতর দোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

কাঁকড়া ভোজনের পর—তরল দধি পান করিবেন।

দুগ্ধদোহনের সময় যে গাভী অস্থিরতা প্রকাশ করে, তাহার গলদেশে কাঁকড়ার কাণকুয়া বাঁধিয়া দিলে গাভী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্, এ।

অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি ?

—:•:—

পৌষের হিমানীমণ্ডিত প্রভাত। গাঢ় ধূসর কুহেলিকার অন্তরালে তপনের আর্ত্তমূর্ত্তি—তেজোহীন, মলিন। মুক্ত জনতার মুখর কণ্ঠ তখনও পক্ষিকুলের ভোরের ভৈরবী থামাইতে পারে নাই। পল্লী-পথ দু'একটী পথিকের চরণ-চিহ্ন বক্ষে লইয়া, উদয়পুরীর কনকপ্রভার প্রতীক্ষা করিতেছিল। আকাশ তখনও কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। দেহ-মনের বিপুল অবসাদ লইয়া, রুদ্ধ কক্ষে, দুই বন্ধুতে বসিয়াছিলাম। ওষ্ঠাধরচুম্বিত ফুরসীর নল অম্বুরীগন্ধী প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিয়া, ঘরের মধ্যেও কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছিল। আমরা স্মৃতিসর্ব্বস্ব অতীতের রোমন্থন করিতেছিলাম।

সপ্তাহ পূর্ব্বে, বন্ধু এক সংখ্যা "আয়ুর্ব্বেদ" পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে সেই আয়ুর্ব্বেদেরই প্রসঙ্গ চলিতেছিল।

বন্ধু বলিলেন—"বড় বড় কবিরাজের বাড়ীতে ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সে শিক্ষার ফলে, অনেক ছাত্রই দেশমান্য কবিরাজ হইয়াছেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, তবে আর তোমারা বেশী কাজ কি করিবে? অনেক কবিরাজই ত ডাক্তারী পাশ করিয়া, তবে বৈদ্যশাস্ত্র পাঠ করিতেছেন; সুতরাং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, ডাক্তারী ও কবিরাজী একত্র মিলাইয়া, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়-স্থাপনের উদ্দেশ্য কি?

বন্ধুর প্রশ্নের যাহা উত্তর দিয়াছিলাম, সেই কথাই আজ সকলকে শুনাইব। আমার বিশ্বাস—আমার এই তত্ত্বজিজ্ঞাসু বন্ধুটীর মত—অনেকেই অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের মহান্ উদ্দেশ্য এখনও বুঝিতে পারেন নাই।

কবিরাজ মহাশয়দের বাটীতে ছাত্র পড়ান হইয়া থাকে। সে সকল ছাত্রের মধ্যে দুই একজন খুব নামজাদা চিকিৎসকও হন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয়—আয়ুর্ব্বেদ যতটুকু কবিরাজি ব্যবহারে লাগে, কবিরাজগণ ছাত্রদের কেবল সেইটুকুই শিক্ষা দেন। ইহাতে বিপুলায়তন সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের ধারণাই হয় না। যাহারা আয়ুর্ব্বেদকে কেবল কবিরাজী শাস্ত্র বলিয়া জানেন, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের মহিমা অবগত নহেন। আয়ুর্ব্বেদ জগতের একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ—অতলস্পর্শ অনন্ত মহাসাগর; 'এলোপ্যাথি' 'হোমিওপ্যাথি', টিস্যুরেমিডি, "ইউনানি" প্রভৃতি নিখিল চিকিৎসা-বিজ্ঞান—সে মহা-সমুদ্রের এক একটী তরঙ্গ মাত্র। সাহস করিয়া বলিতে পারি—সমগ্র পৃথিবীর চিকিৎসার মৌলিক তত্ত্বগুলি আয়ুর্ব্বেদের সূত্রের উপর স্থাপিত। আপনারা আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা, শারীর, বিমান, কল্প. সূত্র, সূত্রান্ত সকল মিলাইয়া দেখুন, এমন সূক্ষ্ম, এমন বিরাট, এমন সরল, এমন সম্পূর্ণ, এমন সুন্দর, এমন উদার বিজ্ঞান জগতে আর দ্বিতীয় নাই!

তাই অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, পৃথ্বীবাসীকে আমরা আয়ুর্ব্বেদের—"বিশ্বরূপ" দেখাইতে চাই। আমাদের "অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"—আয়ুর্ব্বেদের বিশ্ব-বিদ্যালয় হইবে। কিন্তু আমাদের কাজ বড় কঠিন; তাহার গুরুত্ব একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অল্প কথায়

প্রকাশ করা অসম্ভব। আমাদের কার্য্যনির্দ্দেশ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইবে। কেননা—বৈদিক, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগভেদে— আমাদের আয়ুর্ব্বেদেরও পাঁচটি অবস্থা। আমাদের কার্য্যের তালিকা-অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

১ম। পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন।

২। শল্যতন্ত্র ও শবচ্ছেদ।

৩। ভৈষজ্যের রাসায়নিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

৪। রুগ্ণাবাস ও ভৈষজ্য উদ্যান স্থাপন।

৫। লুপ্ত গ্রন্থের পুনঃপ্রচার।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে হইলে, শারীর বিদ্যা [Anatomy] শারীর তত্ত্ব [Phy siology] নিদান ও রোগ তত্ত্ব [Patho-logy and Etiology] দ্রব্যগুণ [Materia-Medica] চিকিৎসা (Therapeutics) কল্প [Toxicology] স্ত্রীরোগ ও কৌমার ভৃত্য [Gynecology, Child manage] শল্যতন্ত্র [Surgery] ধাত্রী-বিদ্যা ও গর্ব্বিণী ব্যাকরণ [Midwifery] আময়িক শারীর [Morbid Anatomy] এবং প্রত্যঙ্গ ও প্রতিরোগ চিকিৎসা প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। এজন্য পুস্তক প্রণয়নের আবশ্যকতা আছে। আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শনের সহিত মিলাইয়া, আয়ুর্ব্বেদের যে যে অংশ লোপ পাইয়াছে, সেই সেই অংশ নুতন সংযোগ করিয়া সন্দিগ্ধ স্থানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। কিন্তু কাজটী বড় সহজ নহে, জীর্ণ সংস্কার হইলেও ইহার জন্ত বিরাট পুরুষকারের প্রয়োজন। "সুশ্রুত" ও "বাগ্‌ভটের" শারীর স্থানের সহিত, পাশ্চাত্য এনাটমি বা ফিজিওলজির —বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সুশ্রুতের মর্ম্ম শারীর পড়িলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়— আয়ুর্ব্বেদের শারীর ও পাশ্চাত্য এনাটমি উভয়ই এক। ইহার জন্য বড় বেশী পরিশ্রম করিতে হইবেনা। পরিশ্রম করিতে হইবে— সুশ্রুতের অনুক্ত অংশ পূর্ণ করিবার জন্য। যাঁহারা মন দিয়া সুশ্রুত সংহিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন -যুগধর্ম্মে-কালধর্ম্মে -সংস্কারকগণের হাতে পড়িয়া সুশ্রুতের বহু অধ্যায় সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, অনেক স্থল পরিত্যক্তও হইয়াছে। এই সকল অংশ প্রত্যক্ষ-দর্শন-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে পরিপুষ্ট করিতে হইবে, শাস্ত্রদৃষ্ট বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষ দৃষ্টের যদি কোন অনৈক্য থাকে, নিপুণ হস্তে তাহারও মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। এ কার্য্য একের সাধ্যায়ত্ত নহে। একজন বা একদল লোক-এক মহা প্রদে-শের বিশাল দিগন্তব্যাপী মহাক্ষেত্র কর্ষণ করিতে পারে না। তাহাতে সকল ভূমি সমতল হয় না, সর্ব্বত্র সার পড়ে না, অনেক বল্মীক-বন্ধুর স্থান হয় ত তেমনি ঊষর থাকিয়া যায়। আমরা এক জন্ম ধরিয়া আয়ুর্ব্বেদ ক্ষেত্র কর্ষণ করিব। আমাদের উত্তরাধিকারি-গণ— সেই কর্ষিত ক্ষেত্রের বহু দোষ বহু ব্যাপ-ন্নতা দুর করিয়া দিবেন। তাহার পরে আর এক সম্প্রদায় বীজ বপন করিবেন। সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের আত্ম-মহিমায়—সেই বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া দিব্যফলপুষ্প-শোভিত কল্পপাদপে পরিণত হইবে।

আমরা মৈত্রী-স্বাধীনতার অবতার উদার ইংরাজের প্রজা। উদারতা, অনুসন্ধান ও অগ্রগামিত্ব—আমাদের মূল মন্ত্র হউক। যুগে

যুগে মনুষ্যজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতেছে। একযুগ, একজাতি, একদেশ সাকল্য বৈদের [সম্পূর্ণ জ্ঞানের] অধিকারী হইতে পারে না। এ রহস্য, শ্রীকৃষ্ণের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে, ভগবদ্গীতার স্বর্ণমুকুরে একদিন প্রতিফলিত হইয়াছিল, পণ্ডিতবর শবর স্বামী—দূর প্রসারিণী দিব্যদৃষ্টিতে বেদের ভিতর "পিক" প্রভৃতি যাবনিক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদের স্বাধীন শেষ গ্রন্থকার ভাবমিশ্র—অনেক বিদেশী ঔষধের গুণ বর্ণনা করিয়া বিজ্ঞজনোচিত উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশীয় বৈদ্যগণ সেরূপ অসংকীর্ণতা দেখাইতে পারেন নাই বলিয়াই—আয়ুর্ব্বেদের চরম অধঃপতন ঘটিয়াছিল। অতএব, প্রাচ্য বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি দেখিতে হইলে, পাশ্চাত্য আলোকের জীবন্ত রশ্মির সাহায্য লইতে হইবে। সুশ্রুতের শারীর স্থানের অনেক স্থলে পাঠের বিশৃঙ্খলতা বুঝিতে পারা যায়। ডল্লণ ও চক্রদত্ত প্রমুখ টীকাকারগণ—সে সকল স্থানে সংযতবাক্। পাশ্চাত্য ফিজিওলজির বিনা সহায়তায় সে সকল স্থানের মর্ম্মগ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ, এই শারীর তত্ত্বই—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একমাত্র মূল ভিত্তি।

আয়ুর্ব্বেদের শারীর তত্ত্ব -বাত পিত্ত কফ —এই ত্রিধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত। বায়ু পিত্ত ও কফের প্রকৃতি বুঝিলে—দেহের পরিপাক, রস পাক, ইন্দ্রিয়ার্থ, ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞতা জন্মে। কিন্তু এই ত্রিধাতুর বিচিত্র রহস্য সহজবোধ্য নহে। "বায়ু" বলিলে যিনি বাতাস বুঝিবেন, "পিত্ত" অর্থে যিনি যকৃৎনিঃসৃত রস মনে করিবেন, এবং "কফ" বলিলে যিনি শ্লেষ্মাস্রাব বুঝিবেন, তিনি মহাভ্রমে পতিত হইবেন। এই বায়ু, পিত্ত কফকে লক্ষ্য করিয়া ঋষিগণ এমন অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—যাহার অর্থ আমরা সহসা বুঝিতে পারি না। আমাদের টীকাকারগণও অনেক স্থলে তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে সকল অমূল্য ইঙ্গিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পরিস্ফুট হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতার অনেক তথ্য পুরাকালে কেবল উপদেশগম্য ছিল, সেই জন্য তাহা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এখন আমাদের দেশে মর্ম্মজ্ঞ উপদেষ্টার একান্ত অভাব। তন্ত্রান্তর হইতে তদভাব পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। বীজরূপী ঋষিসূত্রের গূঢ় মর্ম্মকে সুব্যাখ্যাত করিয়া মহান্ মহীরুহে পরিণত করিতে হইবে। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। "বায়ু" "পিত্ত" "কফ"—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহার স্বরূপ যে কত সূক্ষ্ম—তাহা দেখিতে গেলে—ঋষিযুগের সৃষ্টি-কুশলী প্রতিভা চাই। এই এই বায়ু, পিত্ত, কফের ক্রিয়া যে কত নিগূঢ় শারীরতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত—অনেকে বৈদ্যই তাহা বুঝিতে পারেন না। অনেকে "বায়ু-পিত্ত-কফ" বলিলে কতকগুলি বিশিষ্টলক্ষণ-সমষ্টি মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে ভাষায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল,—সে ভাষা দেবতার ভাষা; সে ভাষায় একশব্দ বহু অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে। "পিত্ত" অর্থে পিত্তরস, কফ অর্থে কফস্রাব বুঝাইলেও কফ আর কফস্রাব, পিত্ত বা পিত্তরস সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ব্যতীত—ইহার মর্ম্মভেদ করা কঠিন। আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণতত্ত্বে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহার স্থূল অর্থ বোধগম্য হইলেও, সূক্ষ্ম অর্থ বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল শব্দের প্রভেদ

অতি সহজে ধরা যায়। "বাতহর" "বাতঘ্ন" "বাতনুৎ"—ইহাদের স্থূল অর্থ এক, কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থ ভয়ঙ্কররূপে পৃথক্। এ সকল কথা পৃথক্ প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

যোগ্যাকরণপূর্ব্বক অধ্যাপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে জীবন্ত করিতে হইবে। আমরা জানি—মানবের ক্ষুণ্ন জ্ঞান, মহাপাপ। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, নূতন করিয়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে।

২। শল্যতন্ত্র ও শবচ্ছেদ। মহর্ষি সুশ্রুত একজন অদ্বিতীয় সার্জ্জন ছিলেন। সুশ্রুতের প্রত্যেক্ অধ্যায়ে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়—সংশয়-প্রশ্নের অতীত অপার্থিব সত্য জাগ্রত। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এমন কোন বিষয় নাই, যাহার বীজভাব সুশ্রুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুশ্রুত শব-ব্যবচ্ছেদে—সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি মূত্রাশয় হইতে অশ্মরী কাটিয়া বাহির করিতেন। যকৃৎ-প্লীহায় বিদ্রধি হইলে তাহা ভেদ করিয়া দিতেন। যন্ত্র-সাহায্যে মূঢ়গর্ভ আহরণ করিতেন। উদরে আঘাত লাগিয়া ছিন্ন অন্ত্র বহির্গত হইয়া পড়িলে তাহা যথাস্থাপিত করিয়া সেলাই করিয়া দিতেন। নেত্ররোগে—তাঁহার মত অস্ত্র-প্রয়োগ-কুশল চিকিৎসক—দ্বিতীয় কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন-ক্রমে গর্ভিণীর সুখ প্রসবের ব্যবস্থায়, ভ্রূণ-পরীক্ষায়, ধাত্রীবিদ্যায়, তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা পড়িলে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। প্লেফেয়ারের মিডিওফারির সঙ্গে আপনারা তাহা মিলাইয়া দেখিবেন।

সুশ্রুত 'বেসীলি থিওরী' জানিতেন। রাজযক্ষ্মা, কতকগুলি জ্বর, পাপজ ব্যাধি—ইহারা সংক্রামক। কুষ্ঠের ক্রিমি আছে। পাণ্ডুরোগে গর্ভাবস্থায়—রক্তের লাল কণিকা কমিয়া যায়। যক্ষা রোগে হৃদ্‌পিণ্ডে কোটর (ক্যাবিটি) উৎপন্ন হয়। বিসর্পরোগে—রক্ত বিষাক্ত হইয়া পড়ে। বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে হৃদয়ে রক্ত শল্য জন্মায়—তাহার ফলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় মানুষের মৃত্যু ঘটে। বিসূচীকা রোগে, হৃদয়ে রক্তের চাপ বাঁধিতে থাকে। রক্তাতিসার ও উরঃক্ষতে আভ্যন্তরিক ক্ষতের চিকিৎসা করা উচিত। রক্তার্ব্বুদ থাকিলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইত্যাদি বহুবিষয় সুশ্রুত অমানুষিক দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। সুশ্রুতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা—বিরাট বিশাল বিশ্বে এখনও অপরাজেয়।

আমাদের কার্য্য এই সুশ্রুতকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে বাঁচাইয়া তোলা! সুশ্রুত যে সকল শস্ত্রের ও যন্ত্রের নাম করিয়াছিলেন, কয়জন কবিরাজ তাহা চেনেন? আমরা তাহার যথার্থ আকৃতি ও গঠনপ্রণালী জানি না। আমাদের অনূদিত গ্রন্থে—যন্ত্রের নামার্থ, ব্যবহার ও প্রয়োগ ভাবিয়া আমরা কেবল কাল্পনিক চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। সুতরাং সুশ্রুতের এই অংশ ভাল করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের প্রাধান্য বজায় রাখিয়া—বৈদেশিক বিজ্ঞানের সহিত মালীর মত কলম বাঁধিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভিদ্-বিদ্যা অতি সুন্দর। কিন্তু ইহাকেও সরল ও শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া লইতে হইবে। ভেষজ দ্রব্যের, পথ্যাপথ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দেখাইতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের মত সম্পূর্ণ চিকিৎসা কোথাও নাই। আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা-তত্ত্ব - যুগযুগান্তরের সাধনার সফল সিদ্ধি। এখনও বৈজ্ঞানিকের মুখে শুনিতে পাই—"চরকের চিকিৎসা প্রচলিত

থাকিলে, পৃথিবীতে অকালমৃত্যু থাকিত না।" চরকের পরিচয় ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভবে না। 'চরক ৬০০ ছয় শত প্রকার জোলাপ জানিতেন। এমন প্রজ্ঞা-মহিম-দীপ্ত পেলব-সংহিতা—জগতের কোন ভাষাতেই অদ্যাপি সঙ্কলিত হয় নাই। এই চরক-সংহিতাতে এমন অনেক জিনিষ আছে—তাহা এমন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত উপদেশ পূর্ণ—যে সেসকল ইঙ্গিত ও উপদেশ বুঝিতে হইলে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সাহায্য চাই।

অতএব প্রয়োজন মত আমাদিগকে কিছু কিছু ঋণ করিতে হইবে। এই ঋণের নামে কেহ কেহ হয় ত শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি এ অধমের নিবেদন—হবিঃ যেখানকারই হউক—যজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদ মন্ত্রে। ধরুণ—সুশ্রুতের শারীর-তত্ত্ব, বহুতথ্যে পূর্ণ, তাহাতে আমরা জীবদেহের সকল রহস্যই বুঝিতে পারি। শারীর-বিদ্যা—দেহের "ভূগোল" বিদ্যা। সুশ্রুতে তাহার সাধারণ মানচিত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় কোন নদী কল্লোল মুখরা, কোথায় কোন্ পর্ব্বত গগনস্পর্শী, কোথায় কোন্ বন, কোথায় কোন্ নগর অবস্থিত—মানচিত্রে তাহার ইঙ্গিত থাকে মাত্র; কোন পর্ব্বত কত উচ্চ,—তাহার শৃঙ্গের সংখ্যা কত, কোন্ নদী কত গভীর, কোন্ বন কতদূর বিস্তৃত, কোন্ নগরে কোন্ জাতীয় লোকের বাস—তাহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ, এসকল বিষয় সম্পূর্ণ জানিতে হইলে, যে অই নদী স্বয়ং দেখিয়াছে, পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছে, বনে উত্তরণ করিয়া নিসর্গ সুন্দরীর শ্যামল শোভায় মুগ্ধ হইয়াছে, তাহার কাছে গিয়া সমস্তই জানিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদের শল্য তন্ত্র—অব্যবহার্য্য হইয়া অনেক দিন পড়িয়া আছে, যাঁহারা এক্ষণে শল্যতন্ত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন—তাঁহাদের নিকটে গিয়াই আমাদিগকে সেই শল্য তন্ত্র শিখিতে হইবে। তবে আমাদের মূল সূত্র হইবে, অভ্রান্ত ঋষি বাক্য, আর তাহার ভাষ্য, বার্ত্তিক বা টীকা হইবে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য। এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে, আমরা আয়ুর্ব্বেদের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না।

রোগ নিরূপণে আমাদের অনুকূল সহায়—একমাত্র মাধব-নিদান। কিন্তু মাধবকর নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থ বহু তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ। যাহারা অল্প বুদ্ধি শ্রমকাতর, তাহাদের জন্যই মাধবকর তাঁহার "রুগ্বিনিশ্চয়" রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে—মাধবকরের প্রয়াস—আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে দৈন্যের মধ্যে সুখের ক্ষীণ আভাষ মাত্র। সুতরাং মাধব-নিদান ছাড়া প্রকৃত বৈদ্যকে আরও বহুতন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যে দোষদূষ্য লইয়া বৈদ্যগণ প্রকৃতির অন্তরঙ্গ আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছেন, সে দোষদূষ্য যে কি জিনিষ—মাধব-নিদানে তাহার উল্লেখ নাই। ধাতু বিশেষে, প্রত্যঙ্গ বিশেষে—শারীর যন্ত্র বিশেষে বায়ুপিত্ত কফ যে কি, মাধব তাহার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। এক বিকৃত পিত্ত হইতে অতিসার ও প্রমেহ দুইই হইতে পারে, কিন্তু অতিসার বা প্রমেহ বিশেষে—সে পিত্তের স্বরূপ কেমন, অবস্থিতিই বা কোথায়, মাধব তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। অথচ এ সকল তত্ত্ব—মিশ্রকেশের নিদানে আছে, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের নিদানেও আছে। এই সকল নিদান একত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের এই মাতৃভূমি চিরন্তনী কল্যাণী মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন। বিশ্ব-

কাহিনীও মানব-কাহিনীর সংমিশ্রণে আমরাও "মৃত্যুঞ্জয়" হইব।

আয়ুর্ব্বেদের একই ঔষধে—জ্বর, অতিসার, অর্শ, গুল্ম, প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ জ্বর, অতিসার, অর্শাদি যে কোন্ জাতীয়, কি বিকৃত শারীরতত্ত্বে যে তাহাদের উৎপত্তি—জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা সহসা তাহার উত্তর দিতে পারি না। ইহার কারণ—আমাদের আময়িক শারীর বা দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল। অথচ আমাদের সংহিতায়—কত ধাতু, কত বিষ, উপবিষ, কত রত্ন, কত বনৌষধি, কত জীবজন্তু,—ঔষধের উপাদানরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই সকল জিনিষ—আমরা যদি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের প্রণালীতে সাজাইয়া লই তাহা হইলে আমাদের আয়ুর্ব্বেদের সম্মুখে—কোনও প্যাথলজি, কোন মর্বিড্ এনাটমি—অথবা কোনও মেটিরিয়া-মেডিকা—সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। হা ভাগ্য! কেবল পরিশ্রমের ভয়ে, আর অর্থের অভাবে, আমাদের সকল শক্তিই আজ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। অনুতপ্ত যক্ষের বক্ষঃবেদনা - বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে আমাদিগকে আজ মেঘদূতের মন্দাক্রান্তার মত, কেবল অশ্রু সজল করিয়া তুলিয়াছে!

প্রত্যেক চিকিৎসকের পদার্থ-বিদ্যায়, এবং রসায়ন-শাস্ত্রে অধিকার থাকা চাই। মহর্ষি সুশ্রুত শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিয়াছেন - "শুধু আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না। এক গ্রন্থে সকল তত্ত্ব থাকিতে পারে না, এক জন অধ্যাপকও সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে অক্ষম। সুতরাং তোমাদিগকে বহুবিধ শাস্ত্র বিভিন্ন আচার্য্যের নিকটে অধ্যয়ন করিতে হইবে'। বাস্তবিক জড়াত্মকই হউক আর আধ্যাত্মিকই হউক, সকল দর্শনের সহিত আয়ুর্ব্বেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! বৈদ্য হইতে গেলে, সকল শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে হইবে। যেমন, ইন্দ্রিয়ার্থ বোধ কিরূপে হয়, কি জন্য মানুষ চক্ষে দেখিতে বা কর্ণে শুনিতে পায়, এ তত্ত্ব বুঝিতে গেলে—প্রাকৃতিক দর্শনের সাহায্য চাই। দৃষ্টিগত ও কর্ণগত এমন অনেক রোগ আছে,যাহাদের চিকিৎসা করিতে হইলে রূপ ও শব্দ রহস্যের জ্ঞান অনিবার্য্যরূপে আবশ্যক। ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মহামুনি কণাদ—একথা বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক, অদৃষ্ট ও শব্দতত্ত্ব বুঝিবার লোক বর্ত্তমান যুগে কেহ আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বৈশেষিক দর্শনে রসায়ন শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব আছে,—আমাদের মধ্যে কয়জন তাহা পড়িয়াছেন? আমাদের শাস্ত্রে কথায় কথায়—জারণ, মারণ, শোধন, অথচ ঐ সকল ক্রিয়ার রাসায়নিক-তত্ত্ব আমরা জানিতে চাহি না।

পূর্ব্বে—অনেক বৈদ্য, অনেক বণিক্ ব্যবসায়ী, এমন কি অনেক গৃহস্থ পর্য্যন্ত গাছ-গাছড়া চিনিতেন। এখন অনেক সময় ভেষজ উপাদানের জন্য, বাজারের বেদে পসারীর সততার উপর বৈদ্যগণকে নির্ভর করিতে হয়। ইহার যে কি বিষময় ফল—বৈদ্য ভিন্ন সাধারণে তাহা বুঝিবেন না। প্রত্যেক বৈদ্যকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতে হইবে, প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইতে হইবে; বৈদ্যকে স্মরণ রাখিতে হইবে—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারই বংশে একদা মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিভা ছিল নিসর্গের

মুকুর—জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত।

আমরা চরক, সুশ্রুত পড়ি,—রসৌষধি প্রস্তুত করি; কিন্তু যে দর্শনশাস্ত্র অনভিজ্ঞ, শস্ত্র-প্রয়োগের কৌশল জানে না, রসায়ন-তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝে না,—তাহার চরক-সুশ্রুত ও রসগ্রন্থ পাঠ বিড়ম্বনা নহে কি? শুধু ব্যাকরণ ও কাব্যের কৌশলে, ষষ্ঠী, সপ্তমী, সমাস, কারকের যুক্তি অবতারণায়, অন্বয় বা ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্র পড়া হয় কি? কবিরাজের বাটীর ভৃত্য পরিচারকগণও ত অনেক সময় ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিয়া থাকে,—তাহাদিগকে কেহ "বৈদ্য"—সম্ভাষণ করেন কি!

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে আমরা প্রাকৃতিক দর্শন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আলোচনার পথ চির উন্মুক্ত রাখিব। আমাদের দেশে—আর একটী অভাব বৌদ্ধযুগের পর হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। বৈদ্য চিকিৎসার রুগ্ণাবাস বা হাঁসপাতাল নাই! বিপর্য্যস্ত প্রকৃতির করুণ আর্ত্তস্বর—যে দেশের মানুষ পঞ্চ-তন্মাত্র-স্পৃষ্টা প্রকৃতিকে দ্রৌপদীর মত বিবসনা করিয়াছিল, যে দেশের জীবন্ত সোম বিন্দু—সাগরাম্বরা বসুন্ধরার বক্ষে সঞ্জীবনী মহাশক্তি আনিয়া দিয়াছিল,—সে দেশের বৈদ্যগণ—ব্যাধি-ত্রাণ রুগ্ণাবাসের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা কি লজ্জার কথা নহে? আমরা দেখিতে পাই, যে রোগ ডাক্তারে ভাল করিতে পারেন নাই, একজন বৈদ্য সামান্য বনৌষধির প্রয়োগে—সে রোগ আরাম করিয়াছেন,—আমাদের রুগ্ণাবাস নাই বলিয়া এ শুভসংবাদ গগন পবনে ঝঙ্কৃত হইতে পারে না। রুগ্ণাবাসেই—বৈদ্যের প্রকৃত কর্ম্মাভ্যাস। হাসপাতাল আছে বলিয়াই—ডাক্তারী চিকিৎসার এত কারুণ্য প্রসার! কারুণ্যে—যে আয়ুর্ব্বেদের জন্ম,—রুগ্ণাবাস প্রতিষ্ঠিত না হইলে, সে আয়ুর্ব্বেদ কখনই উন্নীত হইতে পারিবে না। আমরা কবিরাজী রুগ্ণাবাস স্থাপন করিতে চাই।

আমাদের আর একটী কাজ লুপ্তগ্রন্থের পুনঃ প্রচার। এখনও আমাদের এমন অনেক পুঁথি আছে—যাহা অদ্যাবধি মুদ্রাযন্ত্রে কবলিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করে নাই। ক্রমশঃ সেইগুলি ছাপাইতে হইবে—নতুবা কীটদষ্ট জীর্ণ পাণ্ডুলিপি ধ্বংসের হস্ত হইতে আর বড় বেশী দিন রক্ষা পাইবে না। এই বিভাগের কার্য্যে যেসকল মহাত্মা আত্ম নিয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগকে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। ভারতের সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালেই আয়ুর্ব্বেদ বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা সংগ্রহের জন্য দেশে দেশে শ্রমণধর্ম্মী সন্ন্যাসীর মত ভ্রমণ করিতে হইবে। যেখানে যাহা পাওয়া যাইবে—তাহা সম্পূর্ণ হউক, অসম্পূর্ণ হউক, অতি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই হউক—সাদরে তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—প্রাচীন বৈদ্য-পরিবার এজন্য আমাদিগের প্রতি অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। যাহার ঘরে প্রাচীন পুঁথি আছে, দেশের উপকারের জন্য তিনি তাহা দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। ইহা ভিন্ন বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, দর্শনে, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা আমরা সংগ্রহ করিব। অতীত সম্বল সংগ্রহ না করিলে, ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

এইরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া আমরা যে নির্ব্বেদ-নিকেতন নির্ম্মাণ করিব, তাহার চূড়া

একদিন হিমাদ্রির মত আকাশ স্পর্শ করিবে। আয়ুর্ব্বেদকে জীবন্ত করিবার জন্যই—"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের" প্রতিষ্ঠা। ইহা ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের সখের সামগ্রী নহে।

আমি অকপটচিত্তে মুক্তকণ্ঠে—আমার দেশবাসিগণের সম্মুখে—আমাদের অভাব অপূর্ণতার কথা নিবেদন করিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—দেশ-হিতৈষীমাত্রেই আমাদের সহায় ও সহচর হইবেন। মেঘ-দুর্দ্দিন আষাঢ়ে জগবন্ধুর রথ যেমন অনেক বন্ধু মিলিয়া টানিয়া তাহা গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দেন, তেমনি আমাদেরও আশা—দেশের লোক, আমাদের মনোরথের গতিতে কৃপাহস্তের অবলম্বন দিবেন। তাঁহাদেরই অনুগ্রহে—শারীর-নিদান শল্যতন্ত্র, গর্ভিণীব্যাকরণ সকল তত্ত্বে সুপুষ্টা-বয়ব বিরাট-দর্শন আয়ুর্ব্বেদ দেশের দৈন্যাতুর-তাকে আবার কোলে তুলিয়া লইবে।

এদেশে একবার একজন জাগিয়াছিলেন,—তিনি কপিলবাস্তর রাজকুমার বুদ্ধদেব, তাহাতেই জগৎ জাগিয়াছিল। আর একবার একজন জাগিয়াছিলেন—তিনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, তিনি ব্রাহ্মণ্যকে পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। তাহার পর আর একজন জাগিয়াছিলেন—তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, তাঁহার প্রেম প্লাবনে—দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল, মানুষ দেবতা হইয়াছিল, সমাজ ভ্রাতৃতন্ত্রের আস্বাদ পাইয়াছিল। সেই একজনের প্রভাব—এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই, আর আমরা এত জন, এত ভাই—আমরা জাগিলে—আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে না? জীবের জীবনরক্ষার জন্য আমরা কি মর্ত্ত্যে ভগবানের সিংহাসন নামাইয়া আনিতে পারিব না? এসো ভাই—দলাদলি ভুলিয়া, সকলে এসো,—তোমাদের বিজ্ঞান ভূমি অনেক দিন হইতে নিষ্ক্রিয় পড়িয়া আছে, তোমরাই তাহা ফেলিয়া রাখিয়াছিলে; শুনিয়াছি—ভূমিকে কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে, তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। তোমাদের বিজ্ঞান ভূমিরও উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, এখন সকলে মিলিয়া, তাহাতে হাত লাগাও—হেমন্তের দিগন্তচুম্বি প্রান্তরে নিশ্চয়ই সোণা ফলিবে। এক সুরে যন্ত্র না বাঁধিলে তারের ঝঙ্কারে তার কাঁপিবে কেন?

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আয়ুর্ব্বেদ কি Empirical ?

—:*:—

(পৌষ সংখ্যার ১৬৪ পৃষ্ঠার পর।)

রূপের অতিযোগ অযোগ, মিথ্যাযোগ কি ?—অত্যন্ত উজ্জ্বল বস্তুর নিরন্তর দর্শন যেমন প্রাতঃসূর্য্য, কোন উজ্জ্বল ধাতুতে কিম্বা দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য কিরণ, বিদ্যুৎ, কিম্বা অতিতীব্র বিদ্যুদালোক দর্শন করিলে রূপের অতিযোগ, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোন বস্তু একবারে না দেখা, রূপের অযোগ এবং অতি সূক্ষ্ম বস্তু, অতি নিকট বা অতিদূরস্থিত বস্তু, উগ্র, ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, ঘৃণাজনক অপ্রিয় ও বিকৃতরূপ নিরন্তর দর্শন করিলে রূপের মিথ্যাযোগ হইয়া থাকে।

শব্দের অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ কি ?—বজ্রধ্বনি, কামান বন্দুকের কঠোর শব্দ, কল কারখানার কর্ণ পীড়াকর ঝন্‌ঝনি, সিংহ ব্যাঘ্রাদির বিকট শব্দ নিরন্তর শ্রবণ করিলে শব্দের অতিযোগ, কর্ণচ্ছিদ্র বন্ধ করিয়া একবারেকোন শব্দ শ্রবণ না করা, শব্দের অযোগ এবং কঠোর বাক্য, প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ, যাহাতে চিত্ত-ক্ষোভ ও ভীতি জন্মে এরূপ শব্দ শ্রবণ করাকে শব্দের মিথ্যাযোগ বলিয়া জানিবে।

গন্ধের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি ?—অতি তীক্ষ্ণ, অতি উগ্র ও দুর্গন্ধি বস্তুর নিরন্তর ঘ্রাণ লইলে গন্ধের অতিযোগ, নাসিকা পথ রোধ করিয়া একবারে কোন দ্রব্যের গন্ধ না লওয়া, গন্ধের অযোগ এবং পচা, ঘৃণিত, ক্লিন্ন, অপবিত্র, বিষাক্ত ও শব প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণ করিলে গন্ধের মিথ্যাযোগ ঘটিয়া থাকে।

রসের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ কি ?—রস একাকী থাকিতে পারেনা, রস শব্দে রসাশ্রয়ী দ্রব্য বুঝাইবে। মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ঝাল, কষায় এই ছয়টী রসাশ্রিত বস্তুর অতিভোজনকে রসের অতিযোগ, একবারে কোন রসাশ্রিত বস্তু ভোজন না করাকে রসের অযোগ এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি পূর্ব্বক আহার না করাকে রসের মিথ্যাযোগ বলে।

আহারের শাস্ত্রোক্ত বিধি কি ? আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন আহারের হিতাহিতভাব আটটী বিষয়ের উপরি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই আটটী বিষয় যথা—প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, ভোজনের নিয়ম এবং ভোজনের কর্ত্তা। খাদ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক গুরু, লঘু প্রভৃতি গুণকে প্রকৃতি বলে যেমন মাষ গুরু, মুগ লঘু। এই প্রকৃতির উপরি আহারের হিতাহিত নির্ভর করে। স্বাভাবিক দ্রব্যের সংস্কারের নাম করণ। সংস্কার শব্দের অর্থ গুণান্তরের সংযোগ। জল, অগ্নি, শোধন, মন্থন, দেশ, বাসন, কালপ্রকর্ষ, ভাবনা ও পাত্রযোগে কিরূপে দ্রব্যের গুণান্তরাধান ঘটিয়া থাকে বলিতেছি। জল, অগ্নি ও শোধন যোগে গুরুগুণ তণ্ডুল হইতে লঘুগুণ অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। এস্থলে অগ্নি, জল ও শোধন যোগে তণ্ডুলে গুণান্তরাধান হইল। মন্থনযোগেও গুণান্তর জন্মিয়া থাকে যথা—শোথকারি দধিকে যদি মন্থন করা যায় তাহা হইলে সেই মথিত দধি স্নেহ যুক্ত হইলেও শোথ নাশক হইয়া থাকে। স্থানের গুণে দ্রব্যের গুণান্তর হইয়া থাকে যথা—ঔষধ বিশেষকে ধান্য রাশির ভিতর রাখিলে গুণান্তর সংযোগ হয়। বাসন অর্থাৎ

অধিবাসনের দ্বারা গুণান্তর হয়—যেমন তিলকে ফুলের সহিত অধিবাসিত করিয়া পীড়ন করিলে ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়। কাল প্রকর্ষে দ্রব্যের গুণান্তর হয় যেমন অরিষ্ট আসবাদিকে নির্দ্দিষ্ট কাল গাঁজাইতে হয় তবে গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। পাত্র বিশেষে গুণান্তর হইয়া থাকে, যেমন—ত্রিকত্রয়াদি লৌহ, লৌহ পাত্রে লৌহ দণ্ডে মর্দ্দন করিবার উপদেশ আছে। ভাবনা দ্বারাও গুণান্তর হয় যেমন—আমলকীকে যদি কোন দ্রব্যের রসে রৌদ্রে শুষ্ক করা যায় তাহা হইলে আমলকীর গুণান্তর হইয়া থাকে। করণের কথা বলা হইল এক্ষণে সংযোগ সম্বন্ধে, বলিব। সংযোগ হেতু আহারের হিতাহিত সাধিত হইয়া থাকে। মধু ও ঘৃত কোনটীই মারক নহে কিন্তু মিলিত হইলে মারক হইয়া থাকে। দুগ্ধ ও মৎস্য পথ্য, কিন্তু সংযোগে কুষ্ঠাদিরোগের জনক হইয়া থাকে। ভাবনা ও সংযোগ এক নহে পার্থক্য আছে। রাশি অর্থাৎ প্রমাণের উপরি আহারের হিতাহিত নির্ভর করে। রাশি দুই প্রকার সর্ব্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি। ভাত, দাল, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ মিলিত হইয়া যে প্রমাণ হয় তাহাকে সর্ব্বগ্রহ রাশি এবং ভাত এত, দাল এত, ব্যঞ্জন এত, দুগ্ধ এত, এই প্রত্যেকের প্রমাণকে পরিগ্রহ রাশি বলে। এই দ্বিবিধ রাশির উপরি আহারের গুণাগুণ নির্ভর করিয়া থাকে। দেশ অর্থাৎ দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার এবং ভোক্তার স্থান অনুসারে দ্রব্যে গুণান্তরাধান হইয়া থাকে, যথা—হিমালয়ে উৎপন্ন দ্রব্য গুরু এবং মরুদেশে জাত দ্রব্য লঘু হয়। যে সকল প্রাণী মরুদেশে বিচরণ করে এবং বহু ক্রিয়াকারী তাহাদের মাংস লঘু, ইহার বিপরীতকারী প্রাণীর মাংস গুরু। ভোক্তা যদি মরুদেশে বাসী হয়েন তাহা হইলে শীতল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং যদি অনুপদেশবাসী হয়েন তাহা হইলে উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য হিতকর হইবে। রসের অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ ব্যাখ্যাত হইল।

স্পর্শের অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ কি? - তৈলাদি তরল বস্তু প্রচুর পরিমাণে মাখাকে "অভ্যঙ্গ" এবং কোন দ্রব্যকে গুঁড়া করিয়া কিম্বা পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করাকে "উৎসাদন" বলে। অতি শীতল কিম্বা অতি উষ্ণ জলে স্নান, অতি শীত বা অতি উষ্ণ বাতাস ("লুর" মত) গায়ে লাগান, অতি উষ্ণ বা অতি শীতল দ্রব্যের অভ্যঙ্গ বা উৎসাদন করিলে স্পর্শের অতিযোগ ও সর্ব্বথা অনুপসেবন, স্পর্শের অযোগ বলিয়া জানিবে। স্নান, অভ্যঙ্গ ও উৎসাদন যদি শাস্ত্রবিহিত বিধি অতিক্রমপূর্ব্বক করা হয়—যেমন স্নানের পর উৎসাদন কিম্বা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া হঠাৎ শীতল জলে অবগাহন, অপ্রীতিকর স্পর্শ যেমন শীতকালে শীতল শয্যা বা গ্রীষ্মকালে উষ্ণ শয্যা, কণ্টক কঙ্করাদির উপরি শয়ন বা উপবেশন, স্পর্শের মিথ্যাযোগ বলিয়া অভিহিত হয়।

আমরা যে হেতু সূত্রের ব্যাখ্যা করিলাম তাহার শেষে বলা হইয়াছে—"ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ" অর্থাৎ অযোগ, অতিযোগ, মিথ্যাযোগরূপ রোগের এই তিনটী সংক্ষিপ্ত হেতু। বস্তুতঃ হেতু তিনপ্রকার নহে অনেক। সকল রোগই প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মার কার্য্য সুতরাং যে যে আহার বিহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হয় তৎসমুদায়ই রোগের হেতু। কি কি আহার বিহারে বায়ুপিত্ত কফের বৈষম্য জন্মে আয়ুর্ব্বেদে সে কথা অতি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসু মূলগ্রন্থ পাঠ করিবেন।

রোগের কারণ কি বলা হইল। এক্ষণে প্রতিজ্ঞানুসারে কারণ কত প্রকার বলিতে হইবে, রোগের প্রভেদ হেতুর বহু সংখ্যক হইলেও এস্থলে প্রসিদ্ধ দশপ্রকার হেতুভেদ লিখিত হইতেছে - (১) সন্নিকৃষ্ট (২) বিপ্রকৃষ্ট (৩) ব্যভিচারী (৪) প্রেরক (৫) উৎপাদক (৬) অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ। (৭) প্রজ্ঞাপরাধ (৮) পরিণাম (৯, বাহ্য (১০) আভ্যন্তর। (১) সন্নিকৃষ্ট হেতু - সন্নিকৃষ্ট শব্দের অর্থ নিকটবর্ত্তী। আজ রাত্রিতে গুরুভোজন করিলাম কল্য প্রাতে আমার অজীর্ণ হইল, এস্থলে গুরুভোজন অজীর্ণের সন্নিকৃষ্ট হেতু। (২) বিপ্রকৃষ্ট হেতু—গ্রীষ্মকালে সমুদ্র তীরবর্ত্তী কোন স্থানে গিয়া সমুদ্রের প্রীতিপ্রদ শীতল বায়ু নিরন্তর সেবন করিয়াছিলাম, গ্রীষ্মাবসানে আমার সেই শৈত্য সেবন জন্য ঘোরতর শ্লেষ্ম-বিকার উপস্থিত হইল এই শৈত্য সেবন শ্লেষ্মরোগের বিপ্রকৃষ্ট কারণ। (৪) ব্যভিচরী হেতু—যে দুর্ব্বল কারণ রোগ উৎপাদন করিতে পারে না তাহাকে ব্যভিচারী হেতু বলে। দধি সেবন তরুণ কফ রোগ জন্মাইতে পারে। আমি দধি সেবন করিলাম কিন্তু কফরোগ হইল না। এস্থলে দধি সেবন ব্যভিচারী হেতু হইল। স্বাস্থ্য যত উত্তম থাকে রোগের নিদানকে ততই ব্যভিচারী করিতে পারা যায়। স্বাস্থ্য যত মন্দ হয় ততই নিদান আর ব্যভিচারী হয় না—সামান্য হেতুতেই রোগ জন্মে। (৪)প্রেরক হেতু শরীরে রোগের কারণ সঞ্চিত আছে কিন্তু যে একটী কারণকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সঞ্চিত কারণ রোগ জন্মাইয়া থাকে সেই উপলক্ষীভূত কারণকেই প্রেরক হেতু বলে। যেমন হেমন্ত কালে আমার শ্লেষ্ম সঞ্চয় হইয়াছে, সেই সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্ত কালের সূর্য্য সন্তাপে কুপিত হইয়া আমার কফরোগ উৎপাদন করিল—এখানে সূর্য্যসন্তাপ কফরোগের প্রেরক হেতু। (৫) উৎপাদক হেতু—আর হেমন্তকালজ যে মধুর রস শ্লেষ্মসঞ্চয়ের কারণ তাহাকেই উৎপাদক হেতু বলে। (৬-৮) - অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিনাম এই তিনটী হেতু পূর্ব্বেই অতি যোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৯-১০) বাহ্য হেতু ও আভ্যন্তর হেতু—আহার, আচার ও কাল প্রভৃতি রোগের বাহ্য হেতু আর বায়ু পিত্ত, কফ এবং রক্ত মাংসাদি সপ্তধাতু রোগের আভ্যন্তর হেতু। দোষভেদে ব্যাধিভেদে এবং দোষব্যাধি উভয়ভেদে যে তিনপ্রকার হেতু স্বীকৃত হইয়াছে তাহা আমরা পরে বলিব।

রোগের হেতু কত প্রকার বলা হইল, অতঃপর আমরা, রোগ কিরূপে জন্মে অর্থাৎ রোগের সম্প্রাপ্তি কি? তাহাই ব্যাখ্যা করিব। অহিত আহার বিহার—যেমন বিকৃত মাংসভোজন কিম্বা রাত্রিজাগরণ রোগের কারণ। এই অহিত আহার বিহার সেবন করিলে কিরূপে রোগোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে তাহা বুঝিতে হইলে নিদান-সেবন ও ব্যাধি-দর্শনের মধ্যে যে কএকটী সূক্ষ্ম অবস্থা ভেদ আছে সেগুলি যথাক্রমে অনুসরণ করিতে হইবে। নিদান সেবনের অর্থাৎ যাহা রোগের হেতু তাহা আচরণ করার পর, প্রথম অবস্থা—সঞ্চয়, দ্বিতীয় অবস্থা—প্রকোপ, তৃতীয় অবস্থা—প্রসার, চতুর্থ অবস্থা—স্থানসংশ্রয়, পঞ্চমঅবস্থা—ব্যাধিদর্শন। নিদান সেবন করিলে যে রোগ জন্মিবেই এরূপ কোন নিশ্চয় নাই। নিদান সেবনে কিম্বা কালধর্ম্মে দোষের সঞ্চয় হইয়া থাকে মাত্র। সেই সঞ্চিত দোষ যদি রোগোৎপাদনের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে

প্রকোপাদি উপরি লিখিত ৪টী অবস্থার পরিণত হইতে পারে, তবেই রোগ জন্মিয়া থাকে। নচেৎ উহা ব্যভিচারী নিদান মধ্যে পরিগণিত হইয়া যায়। সঞ্চয়, উত্তরোত্তর প্রকোপাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ব্যাধি আনয়ন করে তাহাই আমাদের বক্তব্য। সঞ্চিত দোষ অনুকূল অবস্থা লাভ করিয়া প্রকুপিত হয় অর্থাৎ যোগ্য বল লাভ করে। প্রকুপিত দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) পরে প্রসর লাভ করে অর্থাৎ সুস্থ শরীরে বায়ু, পিত্ত, কফ যে যে স্থানে অবস্থিত করে, সেই সেই স্থান হইতে ছড়াইয়া পড়ে। যেমন সুরা প্রভৃতি সন্ধিত হইলে (fermented) যেমন উথলিয়া উঠে, সেইরূপ দোষও শরীরে প্রসরলাভ করিয়া থাকে। বায়ু এই গতিশক্তি দানের কর্ত্তা। বায়ু অচেতন হইলেও রজোগুণ-ভূয়িষ্ঠ বলিয়া কফ, পিত্ত, শোণিতের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। দোষ ছড়াইয়া পড়িয়া শারীরের যে স্থানে রোগ জন্মাইবে সেই সেই অঙ্গে, যেমন—হস্ত, পদ, উদর, মুখ, চক্ষু কি কর্ণ কিম্বা হৃদয়, যকৃৎ, আমাশয়, বৃক্ক বা বস্তি আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহারই নাম স্থান-সংশ্রয়। দোষ স্থান সংশ্রয় করিলে মোটামুটী এই জানা যায় যে, অমুক অঙ্গের বা অমুক আশয়ের রোগ জন্মিবে কিন্তু সেই অঙ্গে বা আমাশয়ে অনেক প্রকার রোগ জন্মিতে পারে, তন্মধ্যে ঠিক কোন রোগটী জন্মিবে তখনও নিশ্চয় করা যায় না। পরে আরও একটু অনুকূল অবস্থা-প্রাপ্ত হইলে, স্থান-সংশ্রিত দোষ কি রোগ উৎপন্ন করিবে জানা যায় অর্থাৎ রোগের পূর্ব্ব-রূপ প্রকাশ পায়। যেমন মেঘদর্শনে বৃষ্টি, পুষ্প দর্শনে ফল অনুমিত হইয়া থাকে তদ্রূপ পূর্ব্ব-রূপ দর্শনে ভাবী ব্যাধির জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন্ রোগের কি পূর্ব্বরূপ তাহা রোগবিনি-শ্চয় গ্রন্থে, বলা হইয়াছে। রোগের পূর্ব্বরূপ আর স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইলে তাহাকে রূপ অর্থাৎ রোগের লক্ষণ বলা হয়। যখন রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনই ব্যাধি-দর্শন অর্থাৎ এই জ্বর, এই অতিসার হইল বলিয়া থাকি। অন্যান্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই ব্যাধি-দর্শনের পর চিকিৎসার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ বলেন ইহা চিকিৎসার পঞ্চম কাল। প্রথম যখন দোষের "সঞ্চয়" হইয়াছিল সেই চিকিৎসার প্রথম কাল। তখন সঞ্চিত দোষ বাহির করিয়া দিলে আর দোষের প্রকোপ হইতে পারিত না। দোষের সঞ্চিতাবস্থায় প্রতীকার না করিলে দ্বিতীয় অবস্থা—"প্রকোপ" প্রাপ্ত হয়, ইহা চিকিৎসার দ্বিতীয় কাল। প্রকোপ-কালে প্রতীকার করিলে আর তৃতীয় অবস্থা—"প্রসার" লাভ করিতে পারে না। দোষ "প্রসারের" অবস্থায় উপনীত হইলে চিকিৎসার তৃতীয় কাল। প্রসার প্রাপ্ত দোষ পরে স্থান সংশ্রয় করে, এই অবস্থা চিকিৎসার চতুর্থকাল। স্থান সংশ্রয়ের পর ব্যাধিদর্শন ইহা চিকিৎসার পঞ্চমকাল। যে চিকিৎসকগণ ব্যাধিদর্শন অর্থাৎ রোগোৎপত্তির পর চিকিৎসা আরম্ভ করেন। আয়ুর্ব্বেদ বলেন তাঁহারা চিকিৎসা করিবার চারিটী অবসর হারাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদের এই অপূর্ব্ব এবং অনন্য-সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা কেবল উপদেশ মাত্র নহে—প্রতিরোগে এইরূপ চিকিৎসা প্রদর্শিত হইয়াছে। সঞ্চয়েই চিকিৎসা করিলে দোষ আর উত্তরগতি লাভ করিতে পারে না; অতএব বর্ষাকালে সঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে প্রকুপিত হইয়া যাহাতে পিত্ত জন্য ব্যাধি উৎপাদন করিতে না পারে তজ্জন্য আয়ু-র্ব্বেদ শরৎকালে পিত্তনির্হরণের ব্যবস্থা দিয়া-

ছেন। আবার শরৎকালে সঞ্চিত কফ যাহাতে বসন্তকালে কুপিত হইয়া কফরোগ জন্মাইতে না পারে তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদ বসন্তে কফনির্হরণের উপদেশ দিয়াছেন। মানুষকে ঋতুকৃত দোষের সঞ্চয় ও প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রধানতঃ আয়ুর্ব্বেদে "ঋতুচর্য্যা" উপদিষ্ট হইয়াছে। সঞ্চয়েই যদি দোষ নষ্ট হইয়া গেল তবে তাহার প্রকোপ প্রসরাদি আর কোথা হইতে হইবে? তারপরে রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলেও যদি প্রতিকার করা যায় তাহা হইলে আর রূপ অর্থাৎ ব্যাধি জন্মিতে পারে না; অতএব আয়ুর্ব্বেদ রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন জ্বরের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে অতি লঘু ভোজন কিম্বা উপবাস করিবার উপদেশ আছে। পূর্ব্বরূপে এই লঘু ভোজন বা উপবাস রূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিলে আর জ্বর হইতে পারিবে না। নিদান সেবন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাধিদর্শন পর্য্যন্ত আমরা ব্যাখ্যা করিলাম বটে কিন্তু একটী কথা বলিতে বাকী আছে। আমরা বলিয়াছি দোষের সঞ্চয় হইতে প্রসর পর্য্যন্ত দোষ কি ব্যাধি জন্মাইবে জানা যায় না, পরে স্থান সংশ্রয় করিয়া পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে তবে কি রোগ জন্মিবে জানা যায়। এ বিষয়ে কএকটী সূক্ষ্ম কথা আছে এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব। দোষ স্থানসংশ্রয় করিয়া পূর্ব্বরূপ প্রকাশের পূর্ব্বে কি রোগ উৎপাদন করিবে যদি জানিতে না পারা যায় তাহা হইলে রোগের নিদান কিরূপে স্থির হয়? অর্থাৎ এইরূপ অহিত আহার বিহার করিলে অমুক রোগ জন্মিবে, ইহা কিরূপে বলা যায়? কারণ প্রথম, অহিত আহার বিহার দ্বারা দোষ সঞ্চিত ও কুপিত হইবে পরে প্রসার লাভ করিবে, তারপর স্থানসংশ্রয় করিবে সুতরাং যাহা চতুর্থ অবস্থায় জ্ঞেয় তাহা প্রথমাবস্থাতেই কিরূপে জানিব? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে যদি এই কথা বলিতে পারা যাইত যে, অমুক আহার বিহার করিলে শরীরের অমুক অঙ্গ বা অমুক আশয় আশ্রয় করিয়া দোষ অমুক রোগ উৎপন্ন করিবেই অর্থাৎ রোগের নিদানের সহিত রোগের জন্মের একটা নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে চতুর্থ অবস্থার কথা প্রথম অবস্থায় বলা আর কঠিন কি? কিন্তু বস্তুতঃ নিদানের সহিত রোগের জন্মের ঐরূপ কোন নিয়ত সম্বন্ধ নাই। নাই বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদ নিদান অর্থাৎ রোগের হেতুকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা (১) দোষ হেতু (২) ব্যাধি হেতু (৩) দোষ ব্যাধি উভয় হেতু। (১) দোষ-হেতু—মধুর রস কফের, তিক্তরস বায়ুর এবং কটু রস পিত্তের সঞ্চয় ও প্রকোপের হেতু। আয়ুর্ব্বেদে ২০ প্রকার শ্লেষ্মরোগ, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ এবং ৮০ প্রকার বায়ুরোগ স্বীকৃত হইয়াছে। মধুরস দোষ-হেতু অর্থাৎ কফের সঞ্চয় ও প্রকোপ করে মাত্র কিন্তু ঐ প্রকুপিত কফ উপরি কথিত ২০ প্রকার কফরোগের মধ্যে কি রোগের উৎপাদন করিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ইহা কেবল দোষের হেতু হইল। (২) ব্যাধি-হেতু—মৃত্তিকা ভক্ষণ পাণ্ডুরোগের হেতু। এই হেতুকে আমরা ব্যাধি-হেতু বলিব। মৃত্তিকা ভক্ষণ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করিবার পূর্ব্বে যদিও বায়ু বা পিত্ত বা কফের প্রকোপ জন্মাইয়া তবে পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে তথাপি মৃত্তিকা ভক্ষণ জন্য কুপিত সেই বাতাদি কেবল পাণ্ডুরোগেই জন্মাইয়া থাকে অন্য কোন রোগ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং এই হেতুকে আমরা

ব্যাধি-হেতু বলিব। ব্যাধি-হেতু হইলেই যখন দোষ-হেতু হইবেই, কারণ দোষ বিনা ব্যাধি জন্মিতেই পারে না, তখন পৃথক-দোষ ব্যাধি উভয় হেতু স্বীকারের প্রয়োজন কি? কেবল চিকিৎসার সুবিধার জন্য এই হেতু ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, যে বস্তু দোষ-হর তাহা সর্ব্বত্র ব্যাধিহর নহে—এখানে আপত্তি হইতে পারে যে দোষ কারণ, ব্যাধি কার্য্য কারণভূত দোষের নিবৃত্তি হইলে কার্য্যভূত ব্যাধির নিবৃত্তি হইবে না কেন? দ্রব্য শক্তির উপরি প্রশ্ন চলেনা। আমরা দেখিতে পাই যে, কোন দ্রব্য দোষ হরণ করে কিন্তু ব্যাধি হরণ করিতে পারে না। এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে কতকগুলি হেতু কেবল দোষ কুপিত করে কতকগুলি হেতু, বিশেষ ব্যাধি উৎপাদন করে। রোগবিনিশ্চয় গ্রন্থে প্রতি রোগের যে হেতু লিখিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি দোষ-হেতু কতকগুলি ব্যাধি-হেতু কতকগুলি বা দোষ ব্যাধি উভয় হেতু। প্রসঙ্গক্রমে হেতু সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া আমারা এই বিষয়ের উপসংহার করিব। অনেক রোগ এক হেতু হইতে জন্মে আবার এক হেতু হইতে একটী রোগও জন্মে। বহু হেতু হইতে বহু রোগ জন্মে আবার বহু হেতু হইতে একটী রোগও জন্মে।

(৫) এক্ষণে আমরা রোগের লক্ষণও রোগপরীক্ষা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের উক্তি ব্যাখ্যা করিব। রোগের লক্ষণ এবং রোগের রূপের একই অর্থ অর্থাৎ যাহা রূপ তাহা লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। "রোগে লক্ষণ" বলিলে রোগ এবং লক্ষণ পৃথক্ বুঝায় কিন্তু লক্ষণ সমষ্টিই ত রোগ, লক্ষণ সমষ্টি ভিন্ন রোগের আর পৃথক্ অস্তিত্ব কোথায়? ঘর্ম্মরোধ সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গ-গ্রহণ ভিন্ন আর জ্বর কি? এই গুলির সমষ্টিই ত জ্বর, কাহার কাহার এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু এরূপ সন্দেহ সঙ্গত নহে। ঘর্ম্ম-রোধ প্রভৃতিই জ্বর নহে। দোষ এবং দূষ্য (রস, রক্ত, মাংসাদি) সংমূর্চ্ছিত হইয়া যে অবস্থা বিশেষ জন্মায় তাহাই জ্বরাদিরূপ ব্যাধি, ঘর্ম্মাবরোধ প্রভৃতি তাহার কার্য্য। অথবা ঘর্ম্মরোধ প্রভৃতি প্রত্যেকে রূপ অর্থাৎ লক্ষণ ইহাদের সমষ্টির নাম ব্যাধি। সমুদায়ি সমুদয় হইতে পৃথক। পলাশ বৃক্ষের সমষ্টিই পলাশ বন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া পলাশবৃক্ষ ও বন এক নহে। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় হয় বটে কিন্তু অনেক ব্যাধির একই লক্ষণ দেখা যায়, আবার একই ব্যাধির বহু লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াথাকে সুতরাং নিঃসংশয় জ্ঞান লাভের জন্য আয়ুর্ব্বেদে রোগের ইতর-ব্যবচ্ছেদক (অন্য হইতে পৃথক করিবার) লক্ষণ এবং প্রায়শঃ দৃষ্ট লক্ষণ উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক চিকিৎসকের জানা উচিত যে রোগ-পরীক্ষা ও রোগি-পরীক্ষা দুইটী পৃথক বিষয়। অনেক সময় দেখা যায় চিকিৎসকেরা রোগ পরীক্ষা লইয়াই তন্ময়, রোগি-পরীক্ষা—যাহার চিকিৎসা হইতেছে তাহার পরীক্ষা যে চিকিৎসা কার্য্যে নিতান্ত প্রয়োজন ইহা অনেক ক্ষেত্রেই বিস্মৃত হইতে দেখা যায়। রোগীকে ভুলিয়া রোগের চিকিৎসা করিলে যে কি বিষম অনর্থোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে তাহা আজ কাল প্রত্যক্ষ করিবার অবসর বোধ হয় অনেকেরই ঘটিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ রোগ-পরীক্ষার সহিত রোগি-পরীক্ষার উপদেশ দিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই, বরং রোগ-পরীক্ষা অপেক্ষা রোগি-পরীক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ভাবে এবং

সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব আমরা অগ্রে রোগি-পরীক্ষা পরে রোগ-পরীক্ষা আলোচনা করিব।

আয়ুর্ব্বেদ বলিতেছেন রোগি-পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিবে রোগীর জন্ম ও বসতি স্থান কোথা, কোথা অবস্থিতিকালে রোগটী উৎপন্ন হইয়াছে, রোগী যেদেশের লোক সেই দেশের লোকের আহার কিরূপ, বল কিরূপ, এবং অভ্যাস কি? এই সকল তত্ত্ব জানিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। শীতবহুল ইংলণ্ড-বাসী ইংরাজ ও গ্রীষ্মবহুল ভারতবাসী বাঙ্গালীর আহার, বল, অভ্যাস একরূপ নহে। একজন আবাল্য মাংসভোজী আর একজন প্রধানতঃ অন্নফলমূলভোজী কচিৎ মৎস্য মাংস ভোজন করে। ইহাদের বলও সমান নহে। সবলের পক্ষে ঔষধের যে মাত্রা হিতকর, দুর্ব্বলের পক্ষে সে মাত্রা মহা অনর্থের হেতু। অভ্যাসও ভিন্ন, একজন ভ্রমেও তিক্তরস সেবন করে না, মধুর ও অম্ল রস নাম মাত্র ভোজন করে। অপরে প্রচুর মধুরাম্লভোজী এবং ইচ্ছা করিয়া তিক্তবস্তু সেবন করে। চিকিৎসকের এই সকল পার্থক্য চিন্তা করা উচিত। এত হইল রোগীর দেশগত পার্থক্য, অতঃপর রোগীর আত্মগত বিষয় চিন্তা করা যাইতেছে। চিকিৎসক রোগীর প্রকৃতি, সার, সংহনন, সত্ত্ব, সাত্ম্য, আহার-শক্তি, ব্যায়াম-শক্তি ও বয়স পরীক্ষা করিবেন।

প্রকৃতি—প্রকৃতি কি? যাহাকে আমরা "ধাত" বলি তাহাই প্রকৃতি—যেমন অমুকের বায়ুর ধাত, অমুকের পিত্তের ধাত ইত্যাদি। এই "ধাত" বা প্রকৃতি কিরূপে জন্মে? গর্ভাধানকালে পিতার শুক্র এবং মাতার অকৃত্রিম আর্ত্তব শোণিত, যে ঋতুতে গর্ভাধান হয় সেই ঋতু, গর্ভাশয়ের অবস্থা, মাতার তৎকালীন আহার বিহার এবং মহাভূত বিকার অনুসারে গর্ভস্থিত শিশুর শরীর নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ শুক্রশোণিত, ঐ গর্ভাশয়, মাতার ঐ আহার বিহার যে যে দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) দ্বারা অনুবিদ্ধ হয় গর্ভস্থিত শিশুর সেই সেই প্রকৃতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ভাব বায়ু দূষিত হইলে বায়ুপ্রকৃতি, পিত্তদুষ্ট হইলে পিত্তপ্রকৃতি, কফ দূষিত হইলে কফপ্রকৃতি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি জন্মের সহিত জন্মিয়া থাকে। এই বাতাদি প্রকৃতি জানিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ বাতাদি প্রকৃতি মনুষ্যের যে লক্ষণ বলিয়াছেন পাঠকের অবগতির জন্য আমরা সংক্ষেপে তাহা লিখিতেছি। কারণের গুণ কার্য্যে প্রকাশ পায়। শ্লেষ্মপ্রকৃতির কারণ শ্লেষ্মা সুতরাং শ্লেষ্ম-প্রকৃতির শরীর শ্লেষ্ম গুণযুক্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্ম শ্লক্ষ্ণ ও স্নিগ্ধ বলিয়া শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্যের শরীর স্নিগ্ধ, দৃষ্টি সুখকর ও সুকুমার হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা মধুরগুণ অতএব শ্লেষ্মপ্রকৃতি লোকের শুক্রধাতু প্রচুর, মৈথুনশক্তি অধিক এবং সন্তান বহু জন্মিয়া থাকে। শ্লেষ্মা সার ও সান্দ্র বলিয়া শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্যের শরীর দৃঢ়, অঙ্গ সমুদায় পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা মন্দ, স্তিমিত, গুরু ও শীত গুণযুক্ত অতএব শ্লেষ্মপ্রকৃতি মানুষেরা অল্প উদ্যোগী ও অল্প আহার বিহার করিয়া থাকে। ইহারা সহজে ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হয় না। ইহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের উত্তাপ ও ঘর্ম্ম অল্প হইয়া থাকে। পিত্ত—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, দ্রব, বিস্র, অম্ল ও কটু গুণ-যুক্ত অতএব পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যগণের উষ্ণ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। গাত্র কোমল হয়, শরীরে তিল, মেছেতা ও চুলকানি প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহাদের ক্ষুধা ও পিপাসা অধিক দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ইহাদের

চর্ম্ম ঢোল হয়, চুল পাকিয়া যায় এবং টাক পড়ে, দাড়ি গোঁপ ঘন হয় না, চুল কটা হয়, ইহারা পরাক্রমশালী হয়, ইহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রবল, ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে, প্রায়ই পেটুক হয়, শরীরের সন্ধি ও মাংসের তেমন বাঁধুনি থাকে না, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মল প্রচুর নির্গত হয়, শরীরে দুর্গন্ধ হয়, শুক্র অল্প এবং সন্তানও অল্প জন্মিয়া থাকে। পিত্ত-প্রকৃতির আয়ু ও বল মধ্যম। বায়ু রুক্ষ, লঘু, চল, বহু, শীত, পরুষ ও বিশদ গুণযুক্ত অতএব বাতপ্রকৃতি পুরুষের শরীর রুক্ষ, অপুষ্ট ও খর্ব্ব হইয়া থাকে। ইহার কণ্ঠস্বর রুক্ষ, ক্ষীণ ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া থাকে, গাঢ় নিদ্রা হয় না, কখন স্থির থাকিতে পারে না, প্রায়ই হাত পা নাড়ে, অধিক কথা বলে, শরীর শিরাব্যাপ্ত, সহজেই চিত্তের বিকার জন্মিয়া থাকে, ভয়, ক্রোধ অধিক হয়, শীঘ্র ধারণা করিতে পারে কিন্তু মনে রাখিতে পারে না, শীতবোধ অপেক্ষাকৃত অধিক ও গা ফাটিয়া থাকে। ইহারা অল্পায়ু, অল্পবল, অল্পসন্তান ও নিধন হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বজপ্রকৃতি হইলে দুইটার লক্ষণ দেখা যায়। বাতপ্রকৃতির বায়ুজন্য রোগ, পিত্তপ্রকৃতির পিত্তজন্য এবং কফপ্রকৃতির কফজন্য রোগ শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাহার যে প্রকৃতি অহিত আহার বিহারে সেই প্রকৃতিভূত দোষ যত শীঘ্র প্রকুপিত হয় অন্য দোষ তত শীঘ্র প্রকুপিত হয় না—যেমন কোন বাতপ্রকৃতির লোক অহিত আহার বিহার করিলে বায়ু যত শীঘ্র কুপিত হইবে কফপিত্ত তত শীঘ্র কুপিত হয় না। এইরূপ কফপিত্ত প্রকৃতির পক্ষেও জানিতে হইবে।

সার—প্রকৃতির পর আমরা সারের কথা বলিব। সার কি? বৃক্ষের সার বলিলে যেমন স্থিরাংশকে বুঝায় মনুষ্যের সার বলিলেও সেই-রূপ মাংসাদি ধাতুর বিশেষ বল বুঝাইয়া থাকে। এই সার সাত প্রকার যথা—ত্বক্‌সার রক্তসার, মাংসসার, মেদসার, অস্থিসার, মজ্জসার, ও শুক্রসার। হৃষ্টপুষ্ট হইলেই বলবান্ এবং কৃশ হইলেই দুর্ব্বল কিম্বা বৃহৎ শরীর হইলেই বলবান্ অল্পকায় হইলেই হীনবল এরূপ কল্পনা করিয়া চিকিৎসক যাহাতে ভ্রমে পতিত না হয়েন তজ্জন্য শরীর ও মনের বিশেষ বলরূপী এই সারতত্ত্ব, তাঁহার আলোচনা করা উচিত। পিপীলিকা ক্ষুদ্রকায় হইলেও যেমন অনেক বড় জিনিষ বহিয়া লইয়া যাইতে পারে, মানুষের মধ্যেও সেইরূপ অনেক মানুষ দেখা যায় যাহারা স্বল্পকায় হইলেও বেশ বলশালী। সারই এই বিশেষ বলশালিত্বের কারণ। সারের দ্বারা যেরূপ শরীরের বল অনুমিত হয় তদ্রূপ মনের বলও জানা যায়। মানুষ যে মহোৎসাহ, ধীর, ত্যক্তবিষাদ, গম্ভীরবুদ্ধি, কল্যাণাভিনিবেশী ও ক্লেশসহ হয় সেও সারের গুণেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমরা ত্বক্ হইতে শুক্র পর্য্যন্ত যে সপ্ত প্রকার সারের উল্লেখ করিয়াছি আয়ুর্ব্বেদে উহাদের বিশেষ লক্ষণ লিখিত আছে—বাহুল্য-ভয়ে সেইগুলি লিখিত হইল না।

(ক্রমশঃ)

খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

যাঁহারা পাশ্চাত্য ভাষায় সুশিক্ষিত, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিমল প্রভায় যাঁহাদের প্রাচীন কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ইংরাজী রীতি, নীতি ও মতিগতির অনুকরণে অভ্যস্ত, তাঁহারাই বর্ত্তমান কালে "শিক্ষিত জন-সমাজ" শব্দের অভিধেয়। প্রোক্ত ভারত-সন্ততিগণের অধিকাংশ লোকেরই ধারণা এই যে ধর্ম্মের সহিত আহারাদির বিধি-নিষেধ বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। ঈশ্বরে ভক্তি, জীবে দয়া, ও সত্যভাষণাদি সদ্‌গুণ থাকিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়। স্নান, শৌচাচার, ললাটতটে চন্দন বা তিলকধারণ এবং দীর্ঘশিখা বন্ধন ব্যাপার নিরর্থক। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের উপাসনায় এই সকল ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন নাই। যে সকল আহারীয় দ্রব্য রসনার তৃপ্তিসাধন করে, যাহা শ্রবণের আনন্দ বর্দ্ধন করে ইত্যাদি বিষয়ভোগ ধর্ম্মের হানি করে না। এই মতে অনেক ব্যক্তি চলিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে রেলে, ষ্টীমারে চলিবার সময় শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত জনমণ্ডল আর জাতি-বিচার করেন না, যে কোন ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্নপানাদি অম্লান বদনে গ্রহণ করিয়া পথ-শ্রান্তি দূর করেন। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে স্নানাদি সদাচার এবং আহারীয় দ্রব্যের গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন সর্ব্বথা ঈশ্বরোপাসনার অনুকূল। স্নান, চন্দনলেপন, শুক্লবসন পরিধান এবং সাত্ত্বিক ভোজন প্রভৃতি সকল বিষয়ই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, তথাবিধ আচরণে মনের পবিত্রতা সাধিত হয়, চিত্ত পবিত্র হইলে আরাধ্য বস্তু লাভ করিতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, আর মনঃ যদি চঞ্চল, কুৎসিত বিষয়ে বিলীন, থাকে তবে আরাধ্য বস্তু কখনই লাভ হয় না। সাধনার অনুরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, এজন্য সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন জন্য পূতচরিত আর্য্যগণ আহারাদির সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন এবং যে বিষয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুকূল তাহার গ্রহণ এবং প্রতিকূল বিষয়ের পরিবর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন —তাহারই নাম শাস্ত্র—"শাস্তি ত্রায়তে যেন তচ্ছাস্ত্রং" সেইজন্য শাস্ত্রের বিধি নিষেধ অবনত মস্তকে মান্য করা কর্ত্তব্য। ঋষিগণ জগতের কল্যাণ কামনায় যে সকল সুনিয়মের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার পরিবর্জ্জন করায় ভারতবাসিগণ দিন দিন ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছেন। মনু বলেন—

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্য মাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥

অর্থাৎ আচারানুষ্ঠান করিলে দীর্ঘ আয়ু, অভিলষিত সন্ততি ও ধন ধান্য প্রভৃতির লাভ হইয়া থাকে, আচার অনন্তলক্ষণ॥ – কোন্ কারণে আর্য্যগণ খাদ্যাদির গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়াছেন এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার কারণ নিশ্চয় করা যাইতেছে; কারণ প্রদর্শনের হেতু এই যে আধুনিক নব্য সভ্যগণ কারণ না শুনিয়া কেবল অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। স্নান* না করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করায় দোষ কি?

* সাংখ্যমতে মনঃ মস্তকের অভ্যন্তরস্থ ঘৃতের ন্যায় পদার্থ দ্বারা তর্পিত হইতেছে। সহস্রারে আজ্ঞাচক্রে মনের বসতি স্থান, স্নান করিলে মস্তক শীতল হয়, সুতরাং মনঃ স্থির থাকে এজন্য সহজেই ধ্যেয় বস্তুর ধারণ করা যায়।

এই কথার সদুত্তর না পাইলে শিক্ষিত সমাজ সন্তুষ্ট হইবেন না; তজ্জন্যই জগতের আদি কারণের কথা বিবৃত হইতেছে;—

এই নিখিল জগতের কারণ "প্রকৃতি"। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি-প্রসূত-জগতের বৈচিত্র্যও প্রকৃতির গুণ-ভেদে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অন্যথা সকল মানুষের বর্ণ,গঠন ও চরিত্র প্রভৃতিও একরূপই হইত। একটী ছাগী একই দিনে কখনই শুক্ল কৃষ্ণ ও কর্ব্বুর বর্ণের শাবক প্রসব করিত না।

এই জগৎ ত্রিগুণাত্মক সুতরাং আমরা যে সকল বস্তু আহার করি, যে যে বিষয়ের উপভোগ করি তাহার কোনটীতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, কোনটীতে রজোগুণের আবির্ভাব এবং কোনটীতে তমোগুণের বিকাশ হইয়া থাকে।

শরীর অন্ন রস হইতে উৎপন্ন; সুতরাং যেরূপ গুণ-বিশিষ্ট অন্ন ভুক্ত হয়, শরীরেও সেই সেই ভুক্তদ্রব্যের গুণাবলী সংক্রমিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং, রজসো লোভ এব চ। প্রমাদ-মোহৌ জায়েতে তমসোঽজ্ঞান মেব চ"। সত্ত্ব-গুণের বাহুল্যে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, রজঃ ও তমোগুণাধিক্যে লোভ, প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানতা উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্য* মাংস ও পলাণ্ডু প্রভৃতির নিরত সেবনে শরীর উষ্ণ এবং চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে; এই সকল কারণে তপশ্চক্ষু ঋষিগণ আহারীয় দ্রব্যের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অবলোকন করিয়াছেন; তজ্জন্যই খাদ্যাদির বিধি নিষেধের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এই বিধি নিষেধের ফলে আর্য্যসন্তানগণ দুগ্ধ, ঘৃত, কন্দ, মূল, ফল প্রভৃতি সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করিয়া রজঃ ও তমোগুণের অল্পতা সাধন করিতে সমর্থ হইতেন; এবং সুদীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে থাকিয়া তীব্র তপস্যা করিতে পারিতেন, তাহার ফলে অমৃতত্ব লাভ করিতেন। চরক বলেন—"হিতাশীস্যান্মিতাশী-স্যাৎ কালভোজী জিতেন্দ্রিয়ঃ" হিত দ্রব্যের আহার করিবে, পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিবে, যথাকালে ভোজন করিবে, এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে, অর্থাৎ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অতি মাত্রায় ভোজন করিবে না।

হিন্দু সন্তানদিগকে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে আর নূতন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই; তাঁহাদের আচার-পূত পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সকল আহারাচার গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই চিরাচরিত পদ্ধতির অনুসরণে ধর্ম্মোপার্জ্জনের পথ সুগম হইবে।

আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিতে গেলে প্রবন্ধ কলেবর নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; এবং পাঠক মহাশয়দিগেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে এজন্য এ বিষয়ের সংক্ষেপে উপসংহার করিতে হইল।

ঋতু-বিশেষে এবং তিথি-ভেদে নানাবিধ পদার্থ উপকারী বা অপকারী হইয়া থাকে। সেজন্য মুণিগণ অষ্টমীতে নারিকেল, ত্রয়ো-

* সঙ্গত মাত্রায় মদ্য পীত হইলে তাহা সুখপ্রদ, স্ফূর্ত্তি ও বলবর্দ্ধক হইয়া থাকে। মদ্যের এই সকল গুণ থাকিলেও বিষয়ী লোকে সুরার মাত্রা ও কাল প্রয়োগ ঠিক রাখিতে পারে না; মদিরার উন্মাদিনী শক্তির বশীভূত হইয়া পড়ে এই জন্য 'মদ্য মদেয় মেপেয় মগ্রাহ্যম্' বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দশীতে যেরূপ ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। মানুষমাত্রেই অনুসন্ধান করিলে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন যে পূর্ণিমা * তিথিতে বিল্বপত্র হইতে সহজেই রস নিঃসৃত হইয়া থাকে; অন্য তিথিতে তত সহজে হয় না; ইহার কারণ এই যে পূর্ণিমায় চন্দ্রমার বলের বৃদ্ধি হয়, চন্দ্রে জলের অংশ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে বলিয়া শশধর-কিরণে পৃথিবী রসবতী এবং শীতল হইয়া থাকে। পৌর্ণমাসীতে সাগর সলিল সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত লইয়া নদনদীর জলেরও বৃদ্ধিসাধন করে, ধরিত্রী জলক্লিন্ন হয় বলিয়া জগতের সকল পদার্থ রসযুক্ত হয়; সুতরাং পৃথিবীস্থ লতাপাতা হইতে ঐকালে স্বল্পায়াসে রস গ্রহণ করা যায়। পক্ষান্তে পৃথিবী রসবতী হয় সেজন্য কফপ্রকৃতি-মানব এবং শ্বাস কাস ও বৃদ্ধি রোগাক্রান্ত জনের পীড়া সকল বৃদ্ধি পায়, কফ ক্ষয় ও রোগের শান্তির জন্য শাস্ত্রকার বলেন;—"কাকজন্ম সহস্রাণি গৃধ্রজন্ম শতানি চ শ্বাপদং লক্ষজন্মানি পক্ষান্তে নিশিভোজনে" সুতরাং প্রত্যেক তিথিতে নিষিদ্ধ বস্তুই আমাদের শরীরের অনুপযোগী; ইহা এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে।

আমরা স্থূলদর্শী অল্পবুদ্ধি মানব, সকল বিধি নিষেধের সুযুক্তি সর্ব্বদা প্রদর্শনে অসমর্থ; কিন্তু ঋষিগণ যোগবলে সকল বিষয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

কেবল আহারের নিয়ম পালনেই অভিলষিত লাভ হইবে না; শাস্ত্রের অন্যান্য বিধানেরও যথাসম্ভব পালন করিতে হইবে।

বসন ভূষণের বিশেষত্বেও মনের গতির বিভিন্নতা হয়। আমার একজন সৈনিক বন্ধু এক দিন বলিয়াছিলেন;—

"আমি যখন সৈনিকের পরিচ্ছদ পরিধান করি তখন আমার বল দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়; রণোৎসাহে রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে, মনে হয় এই দণ্ডেই অরাতিকে ছিন্ন ভিন্ন ও উন্মথিত করিয়া ফেলি"। আরও একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা শুনুন্ —

এক সময়ে কোন মুনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবার মানসে উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মুনি-পুঙ্গবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পুরন্দর এক দিন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তপস্বীকে যথোচিত প্রণাম করিয়া অনেক বিষয়ে আলাপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; সেই পুণ্যাশ্রম হইতে বিদায় হইবার সময় মুনিকে অনুনয়ের সহিত বলিলেন;—মুনে কৃপা করিয়া আমার এই খড়্গ খানি আশ্রমে রাখিয়া দিন্। কয়েক দিন পরে আমি স্বর্গে যাইবার সময় লইয়া যাইব, আমি এখন মুনিগণের পুণ্যাশ্রমাভিমুখে যাইতে ইচ্ছা করি, তথায় বিনীতবেশে যাওয়াই উচিত, অনুমতি করুন্। তাপস বাসবের বিনয়বচনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ইন্দ্রের খড়্গ খানি কুটীরের কোণে রাখিয়া দিলেন; ইন্দ্রও মনে করিলেন যে এইবার তপস্যায় বিঘ্ন হইবার আর বড় বিলম্ব নাই। অদ্য হইতে মুনির হৃদয়ে শক্রের ন্যাসস্বরূপ অসিখানির চিন্তাই সর্ব্বদা জাগরূক হইল, ইন্দ্র কবে আসিবেন, এই অসিখানি যদি কেহ চুরি করে এই মনে করিয়া স্নান ও পুষ্প চয়ন কালেও অসিখানিকে সঙ্গে রাখাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। ক্রমশঃ বন শ্রেণীর অন্তরালে কখন শুষ্ক তৃণ ছেদন করিয়া অস্ত্রের ধারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কখন

* অমাবস্যাতেও পৃথিবী অধিকতর শীতল হয়।

বা হিংস্র জন্তুর বধ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিয়দ্দিবস এই ভাবে অতীত হইলে মুনি ঠাকুর এক মনুষ্যরূপে পরিণত হইলেন, তাঁহার তপোবন-সুলভ শান্ত-স্বভাব দূরে গেল। সুতরাং এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে ক্ষমা-সার ঋষিরাও দয়া দক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণাবলী অলক্ষিত ভাবে বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন; অতএব মানবের পরমাভীষ্ট লাভেচ্ছু পুরুষগণ স্বেচ্ছারিতা পরিত্যাগ করিয়া সদাচার সম্পন্ন হউন। নানা জাতির স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া শারীরিক মানসিক ও নৈতিক অবনতি লাভ করিবেন না।

ধর্ম্মের সহিত আহার আচারাদির নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, "যঃ শাস্ত্র বিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্। যে ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধান অমান্য করিয়া করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয় সে সিদ্ধি, সুখ এবং উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে না। অলমতি-বিস্তরেণ।

শ্রীসারদাচরণ সেন, কবিরত্ন।

(দারভাঙ্গা)

বাধক রোগ চিকিৎসা।

লীলা ও সরমা।

—:*:—

লী। এই ঘরেই ঠাকুমা থাকেন, এখনই আস্‌বেন।

স। আমার ভাই কিন্তু বড্ড লজ্জা করে, আমি ঠাকুমার সুমুকে সব কথা বলতে পারবো না।

লী। ন্যাকি আর কি! রোগের কথা বল্‌বি তার আবার লজ্জা কিসের।

স। তা হক ভাই, আমি পারবো না। তোমারত সব বলিছি তুমিই বলো।

লী। আচ্ছা, তা আমিই বলবো। কিন্তু তুই আমার কাছে বসে থাকিস, যেখানটা আমার ভুল হবে কি আমার মনে না হবে আমার গা টিপে চুপি চুপি বলিস।

স। আচ্ছা তা বল্‌বো।

(ঠাকুমা ও ছোট বৌয়ের প্রবেশ)।

ছো। (লীলাকে প্রণাম করিয়া) ঠাকুরঝি কখন এয়েছ, বাড়ীর সব ভালত?

লী। এই আসছি ভাই, বাড়ীর সব ভাল। কিন্তু তুই যে একেবারে প্রণাম করে ফেললি, তোকেত কখন কারও কাছে মাথা নোয়াতে দেখিনি।

ছো। ঠাকুরঝি, সে দোষ কি আমার? ছেলে বেলা থেকে যেমন শিক্ষা পেয়েছিলাম, সেই রকম ব্যবহার করতে শিখেছিলাম।

ঠা। ছোট ঠিক কথা বলেছে। ক'নে বউগুলিকে তাদের স্বভাবের জন্যে শ্বশুর বাড়ীতে অনেক সময় গঞ্জনা সইতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাদের দোষ কি। তারা যে রকম শিক্ষা পায় সেই রকম হয়। তা লোকে যদি

নিজেদের সমান যাদের আচার ব্যবহার তাদের ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে আসে তা হলে ভাল হয়।

লী। আমি বলি কি ঠাকুমা যে বিবিয়ানা শিক্ষা দেশ থেকে উঠে যাওয়া দরকার।

ছো। সে যে হয় তাত বোধ হয় না ঠাকুরঝি। আমি ছেলে মানুষ হলেও অনেক বাড়ীতে গিয়েছিত, সব জায়গায় সাহেবিয়ানা আর বিবিয়ানা। হিন্দুয়ানী বড় দেখতে পাইনে। বাপ মাকে দুবেলা প্রণাম করা ঠাকুরদের প্রণাম করে বাড়ী থেকে বেরোনা কেবল এই বাড়ীতেই দেখছি।

লী। ছোটবউ ঠিক কথা বলেছে ঠাকুমা। এ স্রোত আর কি ফিরবে।

ঠা। ফিরবে বই কি দিদি, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের কি বিনাশ আছে। যখন দেশের লোকে নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, যখন আর্য্যধর্ম্মের মহত্ব বুঝতে পারবে, তখন আবাব তারা হিঁদু হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের স্রোত ত ফিরবেই, শুনতে পাই আজ কাল কয়েক জন খ্রীষ্টানও নাকি হিঁদুর মত চাল চালন আরম্ভ করেছে।

লী। যাক্, এখন আমাদের ছোটবৌ যে ফিরেছে সেই ভাল।

ঠা। হাঁ ছোট খুব ফিরেছে। এখন ঠাকুর, দেবতা, ব্রাহ্মণে ভক্তি হয়েছে, গুরুজনের সেবা করতে শিখেছে, আমার সেবাত খুবই করে। এখন আর ছোট সে বাবু নেই।

ছো। এর মূল কিন্তু ঠাকুরঝি তুমি। সে পোষাকে বড় ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ী নেমতন্ন খেতে যাবার সময় বকুনি খাই, এখন মনে হয় কি করে গেরস্তর বউ ঝি সে রকম পোষাক পরে বেরোয়। সে দিন না বকে যদি আমায় প্রশ্রয় দিতে তা হলে আমার চাল কখনই শোধরাত না।

লী। তাইত হয়। যে বাড়ীর গিন্নিরা বা কর্ত্তারা বউ ঝিদের বেয়াড়া চাল দেখে শাসন করে না, সে বাড়ীর বউ ঝির চাল কখনই শোধরায় না।

ঠা। তা লীলা বোস দাঁড়িয়ে রইলি কেন। ছোট এখন এখানে থাকবি নাকি?

ছো। না, আমার ঠাকুরের পুজোর যোগাড় করে দিতে হবে আমি যাই।

(ছোট-বৌয়ের প্রস্থান)

লী। (সরমাকে দেখাইয়া) ঠাকুমা, একে চিন্তে পার।

ঠা। (নিরীক্ষণ করিয়া) তোর ছোট ননদ সরমা যে। ভাল আছিস ত সরমা।

স। (পদধূলি লইয়া) হাঁ ঠাকুমা।

ঠা। জন্ম এইস্ত্রি হও দিদি, পাকা মাথায় সিঁদুর পর।

লী। সরমা কিন্তু ভাল নেই ঠাকুমা। ওর একটা অসুখ হয়েছে।

ঠা। কি অসুখ?

লী। বাধক। তা অনেক ডাক্তারী ওষুদ খেয়েছে কিছুতে কিছু হয় না। শেষে আমার মুখে শুনে তোমার কাছে এয়েছে।

ঠা। আ! বাধক আর হিষ্টিরিয়া এযেন আজ কাল মেয়েদের হওয়া চাই। আমাদের আমলেত এসব বিদ্ঘুটে রোগের এত আমদানী ছিল না।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা এসব রোগ আজ কাল এত হচ্ছে কেন?

ঠা। তার কারণ অনেক, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। এই ধর ছেলেবেলা থেকে আজ কালকার মেয়েরা এমন নাটক

নভেল পড়ে, যাতে তাদের উত্তেজনা হয় অনেক সময় গরম জিনিষ খায় যাতে সেই উত্তেজনাকে বাড়িয়ে তোলে। থিয়েটার দেখা তাঁর কম সাহায্য করে না। আগে ঘরে সব ঠাকুর দেবতার ছবি থাকত, এখন ঘরে যে সব ছবি টাঙ্গান থাকে সে গুলিও বড় কম সহায়তা করে না। এই সব কারণে ছোট ছোট মেয়েদের মন আর শরীর এঁচোড়ে পাকতে থাকে। তার পর প্রথম পুষ্প দর্শনের সময় থেকে স্ত্রীধর্ম্মের সময় যে রকম সুনিয়মে থাকা উচিত সে রকমে কেউ থাকে না।

নী। কি রকম ধরা কাটায় থাকতে হয় ঠাকমা।

ঠা। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে থাকতে হয়। দিনে ঘুমুতে নেই, গায়ে সুগন্ধ বা অন্য কিছু মাখতে নেই, স্নান করতে নেই, নখ কাটতে নেই, তাড়াতাড়ি হাঁটতে কি দৌড়াতে নেই, চেঁচিয়ে কথা কইতে নেই, বেশীক্ষণ কথা কইতে নেই, উচ্চ শব্দ শুনিতে নেই, চুল আঁচড়াতে নেই, গায়ে বাতাস লাগাতে নেই, পরিশ্রম করতে নেই, মনের কোন রকম উদ্বেগ হওয়া ভাল নয়, হাঁসতে কাঁদতে নেই। আজ কাল এসব নিয়ম কি কেউ মানে। ঐ অবস্থায় গাড়ী করে বেটা-ছেলের সঙ্গে বেড়ায়, থিয়েটার দেখে আমোদ আহ্লাদ করে। তা এতে আর রোগ হবে না।

নী। আচ্ছা আর কিছু নিয়ম আছে ঠাকমা?

ঠা। তিন দিন হবিষ্যি করতে হয়, হাতে, সরায় কি কলাপাতে খেতে হয়, আর মাটীতে কি কুশ পেতে শুতে হয়।

নী। তা শীত কালে কুশ পেতে শুধু গায়ে কি মানুষে শুতে পারে।

ঠা। পাগল আর কি! শাস্ত্র কারেরা দিগ্‌দর্শন মাত্র করিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝে অবস্থা মত ব্যবস্থা করতে হয়। এই সময়ে স্ত্রীলোকের শরীরের একটা পরি-বর্ত্তন ঘটে, ডিম্বাধার (ovary) আর জরা-য়ুতে (uterus) একটা কার্য্য প্রবাহ চলে। এসময়ে শরীর বা মনের কোন রকম উদ্বেগ হলে সেই কার্য্যে বাধা বা বিপর্য্যয় ঘটে থাকে। সেই জন্যে এই সময় কোন রকম সুখ দুঃখ ভোগ না করে প্রশান্ত ভাবে থাকতে হয়। শীতকালে মাটীতে কি কুশে না শুয়ে একটা কি কম্বলের উপর একটা কম্বল গায়ে দিয়ে শুলেই চলে।

নী। আচ্ছা আর কি কারণ আছে বল?

ঠা। আর একটা কারণ অসংযম। আজ কাল মেয়ে পুরুষ দুই অসংযত হয়ে পড়েছে। অমাবস্যা পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র কিছুরই বিচার করে না। তার পর সর্ব্বদা স্ত্রী পুরুষে এক জায়গায় থাকাটাও ভাল নয়।

নী। আরও কিছু কারণ আছে নাকি।

ঠা। খুঁজলে অনেক মেলে তবে মোটা-মুটি এই। তবে আর একটা কারণের কথা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বাপ মা যারে হাতে দিত সে কাণা খোঁড়া নির্গুণ যেমনই হক স্ত্রীলোকে তাকে দেবতার মত ভক্তি করত। এখন নবেল পড়ে সকলে মুখে না বললেও স্বামীকে বেশ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারে না। এর সঙ্গে এই সব অসুখের কিছু সম্বন্ধ আছে বোধ হয়।

নী। আচ্ছা এখন ছোট ঠাকুরঝির কি হবে বল?

ঠা। কি হয়েছে বল।

নী। কেন বললাম্ ত বাধক

ঠা। বাধক বল্লে কি কিছু বোঝা যায়, না বাধক একটা রোগের নাম।

লী। সে কি ঠাকুমা বাধক রোগের নাম নয়।

ঠা। লোকনাথ বদ্দি বলতেন যে এদানীর কবিরাজে বাধক রোগের নাম দিয়েছে বটে, কিন্তু স্ত্রীরোগ হয়ে সন্তান জন্মাতে বাধা ঘটলে তাকে বাধক বলে। সরমা তোমার কি হয় বলত।

স। (লীলার প্রতি চুপে চুপে) আমি বলতে পারব না বৌ তুমি বল।

লী। আমি বলছি শোন ঠাকুমা। ওর ঠিক মাসে মাসে হয় না একটু দেরী করে হয়, দৈবাৎ ঠিক একমাস পরে হয়। দৈবাৎ পরিষ্কার লাল রঙ্গের হয় নৈলে প্রায়ই কালচে দুর্গন্ধ, দু একটা ডেলার মত ও দেখা যায়, আর সহজের চেয়ে প্রায়ই কম হয়। সকল বার যন্ত্রণা হয়, কিন্তু কোন কোন বার বড় যন্ত্রণা হয়। যতক্ষণ রক্তটা না ভাঙ্গে ততক্ষণ যন্ত্রণা থাকে ভেঙ্গে গেলে যন্ত্রণা কমে যায়।

ঠা। এদিকে খিদে, ঘুম, বাহ্যে প্রস্রাব কেমন হয়?

লী। তা প্রায় স্বাভাবিক তবে বাহ্যে বেশ পরিষ্কার হয় না, ২।১ মাস অন্তর এক দিন ২।৪ বার পাতলা দাস্ত।

ঠা। বয়স কত হয়েছে?

লী। এই আঠার বছরে পড়েছে।

ঠা। এর মধ্যে পোয়াতি টোয়াতি হয় নি?

লী। না, যখন চৌদ্দবছর বয়স তখন থেকে এই রোগে ভুগ্‌ছে।

স। (লীলার প্রতি চুপে চুপে) এদানী ২।১ বার জলের মত ভেঙ্গেছে।

লী। কিছুদিন হল ২।১ বার জলের মত শাদা শাদা ভেঙ্গেছে ঠাকুমা।

ঠা। হাঁ এই থেকে ক্রমে শ্বেত প্রদরে দাঁড়ায়।

লী। তা যাতে না দাঁড়ায় তাই কর। বলি ভাল হবেত ঠাকুমা?

ঠা। ভাল হতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা করান বড় কঠিন।

লী। তা যত কঠিনই হক আর যত খরচ পত্র হক তা করতেই হবে, তুমি ভাল করে দাও।

ঠা। খরচ পত্র বড় বেশী কিছু হবে না। সুনিয়মে থাকাই কঠিন।

লী। তা সে যেমন কঠিনই হক, কি করতে হবে তুমি বল।

ঠা। প্রথম কথা এই যে যতদিন অসুখ ভাল না হয় ততদিন স্বামী-স্ত্রীতে পৃথক্ ভাবে থাকতে হবে।

লী। সে কত দিন।

ঠা। তা প্রায় এক বৎসর।

লী। সে কি এত দিন।

ঠা। হাঁ এত দিন বরং বেশী। দেখ একটা যান্ত্রিক রোগ হলে ভাল হওয়াইত শক্ত, তার পর যদি ভাল হয় তবে বেশী দিনে। এই সব রোগে অনেকে এই নিয়ম পালন করতে পারে না বলে প্রায়ই রোগ ভাল হয় না সঙ্গের সাথী হয়।

লী। তা এত দিন স্বামী-স্ত্রীতে আলাদা থাকতে হবে।

ঠা। তা হবে বৈকি। দেখ শরীর অসুস্থ হলে যেমন তার বিশ্রাম দরকার, নইলে কি রোগ সারে।

লী। তা এর চেয়ে কম দিন থাকলে হবে না, ওষুদ না হয় খাবে।

ঠা। তাতে কাজ হবে না। কতকটা ভাল হয়ে আবার রোগ প্রবল হবে।

লী। (চুপে চুপে সরমার প্রতি) কেমন না পারবি?

স। (চুপে চুপে) তা-সে তা-না হয়-তা আমি কি করে বল্‌বো, সে তোমার ঠাকুর জামায়ের হাত।

লী। তাই চেষ্টা করতে হবে ঠাকুমা এখন এর পথ্যি আর ওষুদ কি বল।

ঠা। পথ্যির বিশেষ ধরা কাটা করতে হবে না, তবে মাছ, কুলথি কলায়, মাষ কলায়, তিল, দই, মাংস, কাঁজি এই সব জিনিষ বেশী করে খাবে।

লী। আর যেমন নাওয়া খাওয়া করে, সব সেই রকম করবে।

ঠা। হাঁ তাই করবে, তবে ছুটো কথা মনে রাখতে হবে যাতে মনে কোন রকম উত্তেজনা না হয় এরকম ভাবে থাকতে হবে। অযথা নভেল না পড়ে, রামায়ণ, মহাভারত পড়বে। থিয়েটার কি ঐ রকমের নাঁচ তামাসা দেখা বন্ধ করতে হবে। স্বামীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল।

লী। তা হলে একেবারে সন্ন্যাসিনী হতে হবে বল।

ঠা। সেই রকমই বটে। রোগ হয় নিজের পাপে, তার প্রায়শ্চিত্ত চাইত। বাস্তবিকই এসব রোগ হলে যদি ঠাকুর দেবতা সেবা করে আর পূজা করে দিন কাটায় তা হলে রোগ ভাল হয়ে যায়।

লী। আর একটা কথা কি?

ঠা। আর এটা কথা এই যে তলপেটে যেন কোন রকম আঘাত কি চাড় না লাগে। ভারি জিনিষ তোলা, বেশী সিঁড়ি ভাঙ্গা এসব করা হবে না।

লী। আচ্ছা এসব ব্যবস্থাত হল এখন ওষুদের কথা কি বল?

ঠা। ওলট কম্বলের ছাল কাঁচা যোগাড় করতে হবে। সেই কাঁচা ছাল ॥৹ তোলা আর মরিচ দু আনা এক সঙ্গে বেটে সকালে একবার করে খাবে।

লী। রোজ যদি কাঁচা ছাল না পাওয়া যায় শুক্‌নো নিলে হবে না?

ঠা। কাঁচা ছাল টাই বেশী উপকারী। শুক্‌নো ছাল কি আরকে কাঁচা ছালের মত কাজ করে না তবে মধ্যে মধ্যে যদি না পাওয়া যায় তা হলে শুক্‌নো ছালই এক সিকি বেটে খাবে। ছাল শুক্‌নো হলেও যেন বেশীদিনের না হয়।

লী। না একেবারে একটানা খাবার দরকার সাত দিন খেয়ে দু চার দিন বন্ধ দেওয়া ভাল। তবে স্ত্রী-ধর্ম্ম হবার আগে তিন দিন ওষুধ পড়া চাই। স্ত্রী-ধর্ম্মের তিন দিন ওষুদ খাওয়া চাই।

লী। এর কি আর কোন ভাল ওষুদ নেই ঠাকুমা?

ঠা। এইটেই খুব ভাল ওষুদ। তবে আরও দুই একটা বলি শিখে রাখ। জবাফুল কাঁজির সঙ্গে বেটে খেলে উপকার হয়। লতা কটকীর পাত ঘিয়ে ভেজে খেলে উপকার হয়। আর একটা পাচন বলি শোন। আকনাদি, শুঁঠ, পিপুল মরিচ ও কুড়চি (জীবক) ছাল প্রত্যেকটী সাড়ে ছয় আনা ওজনে নিয়ে থেত্তো করে আদসের জলে নূতন হাঁড়িতে কাঠের মন্দ মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করবি। যখন

আধপোয়া আন্দাজ জল থাকবে তখন নামিয়ে ছেঁকে ঠাণ্ডা হলে খাওয়াবি।

লী। পাচন কি রোজ তৈয়ের করে খেতে হবে?

ঠা। হাঁ, রোজ তৈয়ের করতে হবে বৈকি। তবে এক লাগাড়ে ওষুধ খেয়ে কাজ নেই, সাত দিন খেয়ে ছদিন বন্ধ দেওয়া ভাল। আর স্ত্রী-ধর্ম্মের সময় কোন ওষুদই খেতে নেই।

লী। জবাফুল আর লতাকটুকীর পাতা কতটা করে খেতে হয়।

ঠা। জবাফুল আধ তোলা থেকে এক তোলা আর লতাকটুকীর পাতা এক তোলা থেকে দু তোলা পর্য্যন্ত।

লী। তা মাত্রা কম বেশী কি হিসাবে করতে হয়?

ঠা। সকলের শরীর, রোগও সমান নয়, কাজেই একরকম মাত্রা সকলের পক্ষে ঠিক হয় না, তবে প্রথম থেকে কম মাত্রায় আরম্ভ করাই ভাল। তার পর সে মাত্রা যদি বেশ সহ্য হয় তা হলে ২।৩ দিন পরে এক আনা বাড়িয়ে দিলে আবার ২।৩ দিন পরে এক আনা বাড়িয়ে দিলে। এমন করে ক্রমে বাড়াতে হয়।

লী। তা মাত্রা বেশী হলে কি করে বোঝা যাবে?

ঠা। তা হলে খিদে কম হবে, সমস্ত দিন ওষুদের ঢেকুর উঠবে, আর হয় বমি ভাব, নয় শরীরের গ্লানি একটা না একটা উপসর্গ দেখা দেবে। এই রকম হলেই মাত্রা বেশী হয়েছে বুঝতে হবে আর মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে।

(মনোরমার প্রবেশ)

লী। একি মনু যে! তোরা পশ্চিম থেকে কবে এলি!

ঠা। কে মনু এয়েছিস আর দিদি বেশ। সকলে ভাল আছে ত?

ম। (ঠাকুমা ও লীলাকে প্রণাম করিয়া) পশ্চিম থেকে আজ চার দিন এয়েছি দিদি। আর সকলে ভাল আছে, কিন্তু আমি ভাল নই।

ঠা। কেন কি হয়েছে তোর? তাইত বড্ড রোগা আর ফেকাশে হয়ে গেছিস যে।

ম। রোগে ভুগে শরীর একেবারে খারাপ হয়ে গেছে ঠাকুমা। আর তার ব্যবস্থার জন্যেই তোমার কাছে এসেছি। এখন আগে তোমাদের আর লীলা দিদির খবর বল।

ঠা। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবাড়ীর সকলে ভাল আছে। লীলার বাড়ীর ও খবর ভাল। তবে সংসারে পাঁচটা থাকলে একটা না একটা রোগে ভোগে।

ম। তোমার সঙ্গে ইনি কে বড়দি?

লী। চিনিসনে? এ আমার ছোট ননদ সরমা। আয় তোদের আলাপ করে দি। এ আমার পিশতুতো বোন্ মনোরমা, বুঝলে ঠাকুরঝি।

স। (মনোরমার প্রতি) আপনি আমার বড় আমি দিদি বলে ডাকবো।

ম। তা ডেকো কিন্তু আপনিটে বাদ দিয়ো আর তুমি যখন দিদির ঠাকুর ঝি তখন আমি ঠাকুর ঝি বলে ডাকবো। আর দুজনে এসে ঠাকুমার সঙ্গে কি সলা পরামর্শ হচ্ছে বল দেখি।

লী। ঠাকুর জামাই হড়কো হয়েছে তাই বশ করবার মন্তর শিখতে এয়েছে।

স। না দিদি না। তুমি বৌয়ের কথা শুনো না।

ম। তবে ব্যাপার কি?

লী। সত্যি কথা বলবো, দিদিরও যে দশা বোনেরও সেই দশা।

ঠা। কেন ঠাকুরঝি কি হয়েছে?

লী। ওর বাধক হয়েছে, সেই ব্যবস্থা ঠাক্‌মার কাছে এতক্ষণ নেওয়া হচ্ছিল। তুমিও যখন চুপি চুপি ঠাক্‌মার কাছে এয়েছ তখন তোমারও এ রকমই একটা কিছু বলে মনে হচ্ছে।

ম। হাঁ দিদি আমি প্রদরের ব্যেরারামে বড্ড ভুগছি। ডাক্তারী হোমিওপ্যাথি ওষুদ অনেক খেয়েছি কিন্তু কিছুতে কিছু হয় নি।

লী। তা বেশ হয়েছে, ঠাক্‌মার কাছে ব্যবস্থা নাও, এই সুযোগে আমারও ঐ রোগের চিকিৎসাটা শেখা হয়ে থাক।

ম। তুমি বুঝি ঠাক্‌মার বিদ্যে সেরে নেবার চেষ্টায় আছ।

ঠা। ওঃ লীলা আমার একজন সদ্দার পোড়ো। তার তোর অসুখের কথা আগাগোড়া বল।

ম। এ রোগের সূত্রপাত আমার অনেক দিন থেকে হয়েছে তখন আমার ১৪।১৫ বৎসর বয়স। কিন্তু তখন রোগ তত প্রবল হয় নি বলেও বটে আর লজ্জারও বটে কাউকে কিছু বলিনি।

ঠা। এই গুলো মেয়েদের একটা মস্ত ভুল অসুখের কথা কখনও গোপন করতে নেই, আর যত সামান্য রোগই হক, কখন অবহেলা করতে নেই। ঘরে আগুন লাগবা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে না নিবিয়ে দিলে যেমন শেষে আর নেবাবার উপায় থাকে না, রোগও তেমনি গোড়ায় চিকিৎসা না করলে শেষে ভাল হবার উপায় থাকে না।

ম। তা বউ মানুষ এসব রোগের কথা কি করে গুরুজনদের কাছে বলা যায়।

ঠা। হু, রোগের সৃষ্টি করতে তোমরা বেশ পার কিন্তু রোগের কথা বলিতেই যত লজ্জা। আরে গুরু জনদের নাই বল্‌লি, লঘুজন স্বামীকেত বলতে পারিস।

লী। কিন্তু তুমি ঠাক্‌মা নিজে আমাদের দিকে নজর রেখেছিলে।

ঠা। সংসারে পাকা গিন্নি থাকলে তাইত করা উচিত। ছেলেবয়সে লজ্জাও করে বটে আর কোন রকম দোষ ঘটলে তারা বুঝতেও পারে না যে ভবিষ্যতে এর পরিণাম এত ভয়ানক হবে।

মা। ঠিক বলেছ ঠাক্‌মা, এমন হবে তা যদি তখন বুঝতে পারতাম তা হলে আমি নিশ্চয়ই সে সময়ে বলতাম।

ঠা। এই জন্যে গিন্নি বান্নির যৌবির উপর এবং স্বামীর স্ত্রীর উপর নজর রাখা দরকার। আর এগুলোর সূত্রপাত প্রায় বার বছর থেকে ষোল বছরের মধ্যেই হয়। তা যাক এখন তোর রোগের কথা বল।

ম। আগেই বলিছি যে প্রথম থেকেই একটু বেশী রক্ত ভাঙ্গত তার পর ষোল বছরের সময় বড় খুকী হয়। বড় খুকী হবার পর এক বৎসর এক রকম ভালই ছিলাম। তার পর আবার আরম্ভ হল। আবার এক বছর পরে ছোট খুকী পেটে আসে। সেবার অন্তঃসত্বা অবস্থায়ও একটু আধটু রক্ত ভাঙ্গতে লাগ্‌ল। কাজেই ডাক্তার দেখান হল। ডাক্তার দেখিয়ে সে যাত্রায় এক রকম ভাল হলাম। কিন্তু খালাস হবার ছমাস পরেই আবার রোগ দেখা দিল।

ঠা। রোগ কি একভাবে ছিল না ক্রমশঃ বাড়তে লাগল?

ম। ক্রমশঃ বাড়তে লাগল বৈকি। এই সময় ডাক্তারী চিকিৎসা হয়েছিল তাতে একটু ভাল ছিলাম, কিন্তু দিন কতক ওষুদ বন্ধ করবার পরে যে কে সেই। আবার ওষুদ খাই একটু ভাল থাকি। এমনি করে দুবৎসর ভালয় মন্দয় কাটল তার পর বড় খোকা পেটে হল। বড় খোকা যখন পেটে তখনও একটু একটু রক্ত ভাঙ্গত। আবার ডাক্তারী ওষুদ খেয়ে বন্দ করতে হল। বড় খোকা হবার পর ছমাস যেতেই আবার অসুখ দেখা দিলে তখন প্রথমে ডাক্তারী, তার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হল, তার পর একজন হিন্দুস্থানী কবিরাজকেও দেখান হল। ওষুদ খেলে একটু আধটু ভাল থাকতাম, কিন্তু রোগ একেবারে গেল না। তার পর ছোট খোকা হল। ছোট খোকা হবার চার মাস পরে থেকে আজ এক বৎসর অসুখে ভুগ্‌ছি।

ঠা। এখনকার অবস্থা কিরকম বল দেখি?

লী। এখন এক মাসের চেয়েও শীগ্‌গীর হয়, কখন বা মাসে দুবার হয়। রক্ত খুব বেশী ভাঙে। এতে শরীর খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মাথা ঘোরা, বুক ধড় ফড় করা, গা বেদনা, এই সব উপসর্গ জুটেছে। ভাল খিদে হয় না ঘুমও ভাল হয় না।

ঠা। ভয় নেই ভাল হয়ে যাবি। এখন থেকে সুপথ্যে থাকলে আর ওষুদ খেলে শীঘ্র ভাল হয়ে যাবি। তবে আর অত্যাচার না হয়।

ল। আমিত আর কচি খুকি নই, বুড়ো মাগী কি আর অত্যাচার করবো?

ঠা। আমি যে অত্যাচারের কথা বলছি তা কচি খুকিরা করে না তোমার মত বুড়ো মাগীরাই করে থাকে। মোট কথা যাতে আর ছেলে পিলে না হয় সেটা করতে হবে।

ম। সে পরামর্শ আগেই হয়ে আছে ঠাক্‌মা। এখন ২।১ বৎসর আমি এখানে থাকবো আর তোমার নাতজামাই পশ্চিমে থাকবে।

স। তা মাঝে মাঝে আসবেন ত?

ম। সেও আলাদা ঘরে শোবার বন্দো-বস্ত।

ঠা। ভাল বন্দোবস্ত করেছ। তা এ মতলব হল কার?

ম। তাঁর কে একজন ডাক্তার বন্ধু আছেন সেখানে তার পরামর্শে।

ঠা। তা ডাক্তার ভাল পরামর্শই দিয়েছে। এর ওপর আর ছেলে পিলে হলে আর তোকে বাঁচান যেত না। আজ আমাদের দেশে এইটে বড় বাড়াবাড়ি। অল্প বয়সে অনেক গুলি ছেলে পিলে হয়ে-শরীর খোলা হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামী, স্ত্রী, বাপ মা, শ্বশুর শাশুড়ী কারুর চৈতন্য নেই। শেষে শেষে পোয়াতি হয় কতকগুলি কচি কাঁচা রেখে মারা যায়, নয়ত একেবারে রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকে।

লী। থাক্‌ সে কথা, তুমি এখন মনুর ব্যবস্থা কর ঠাক্‌মা।

ঠা। শোন বলি মনু তোর শরীর এখন যে রকম হয়েছে তাতে কিছু দিন তোর পরি-শ্রম না করে একেবারে শুয়ে থাকা দরকার।

ম। তা কি করে হবে ঠাক্‌মা, ছেলে মেয়ে গুলোকে এক একবার দেখ্‌তে হবে ত।

(ক্রমশঃ)

চরকোক্ত ষড়ুপায় বিধি।

অগ্নিদীপ্তি, আহারেতে অভিলাষ হয়,
দেহের লঘুতা জন্মে, রুচির উদয়॥
আহার্য্য অভাবে অগ্নি দোষ নাশ করে,
গুরুত্ব ও জর নাশে, বাসনা আহারে;
সামদোষ, আমাশয়ে অগ্নিমান্দ্য করি,
স্রোতরোধে, জ্বরে তেঁই লঙ্ঘন আচরি।
ত্রিরাত্র, কি এক রাত্র, কিম্বা রাত্রদিবা,
দোষ, বলাবল ক্রমে লঙ্ঘন করিবা॥

সম্যক্ কৃত লঙ্ঘনের ফল।

দেহ লঘু, মল মূত্র-বায়ু নিঃসরণ,
উদ্গার, হৃদয় কণ্ঠ-মুখ বিশোধন;
তন্দ্রা, ক্লান্তি দূর আর রুচি, ঘর্ম্ম হয়,
সম্যক্‌তে ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রসন্ন হৃদয়॥

অলঙ্ঘনের দোষ।

কফ, বমি, বিবমিষা, সদা নিষ্ঠীবণে।
অশুদ্ধ হৃদয় কণ্ঠ তন্দ্রা অলঙ্ঘনে॥

অতিরিক্ত লঙ্ঘনে দোষ।

অতিরিক্ত উপবাসে সন্ধিভগ্নপ্রায়,
[illegible] বেদনা, কাস, মুখশোষ তায়।
ক্ষুধা-রুচি হীন, তৃষ্ণা, দেখা শুনা হ্রাস,
ভ্রান্তি, ঊর্দ্ধবাত, মোহ, কায় অগ্নি নাশ;
গ্লানি শোষ, বলহ্রাস, উপদ্রব হয়।
আরোগ্যের জন্য বল প্রধান আশ্রয়।
বাত বৃদ্ধি, মুখশোষ, ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর,
গর্ভিণী, বালক, বৃদ্ধ, ভ্রান্ত ভয়াতুর,
দুর্ব্বল, পথিক, শ্রান্ত, কাম ক্রোধান্বিত,
ক্ষয়, শোষ, চিরজ্বরে, লঙ্ঘন অহিত।
সামবাতে আমপাক নিমিত্ত লঙ্ঘন।
কফ জ্বর বিধি ক্রমে তদন্তে বারণ॥
কফ পিত্ত দ্রব হেতু সহিবে লঙ্ঘন।
আমপাক হ'লে বায়ু না সহে কখন॥

বৃংহণ বিধি।

পশু, পক্ষী, মৎস্য যদি নহে রোগান্বিত,
বিষাক্ত, বাণাদি দ্বারা অথবা পীড়িত;
প্রকৃতির অনুকূল আহার, বিহার।
বয়স্থা হইলে, মাংস বৃংহণ তাহার॥
ক্ষীণ, ক্ষত, বৃদ্ধ, কৃশ, দুর্ব্বল যেজন,
নিত্য করে যেই ব্যক্তি পথ পর্য্যটন;
প্রতিদিন মদ্যপান নারী সেবা হয়।
গ্রীষ্মকালে বৃংহণীয় তাহারা নিশ্চয়॥
যেই ব্যক্তি শোষ, অর্শ, গ্রহণী পীড়িত,
তারপক্ষে মাংস ভোজী পশুমাংসহিত;
স্নান, নিদ্রা, চিনি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসাদন।
সুমধুর স্নেহবস্তি সবার বৃংহণ॥

রুক্ষণ-বিধি।

কটু, তিক্ত, কষায়াদি দ্রব্য নিসেবন,
স্ত্রীসঙ্গ; সর্ষপ-তিল-খইল ভক্ষণ;
তক্র, মধুপানে হয় রুক্ষতা সাধিত।
কহিব রুক্ষণ কার্য্য যে যে রোগে হিত॥
যেই সব রোগে পুয়ঃ, রক্তাদি ক্ষরণ,
বায়ু, পিত্ত আদি দোষ বৃদ্ধি বিলক্ষণ;
উরুস্তম্ভ, মর্ম্মগত রোগ সমুদয়॥
রুক্ষণ কার্য্যেতে হিত হইবে নিশ্চয়॥

স্তম্ভন-বিধি।

দ্রব, তনু, সর, স্বাদু, তিক্ত ও শীতল,
কষায় দ্রব্যাদি হয় স্তম্ভন সকল।
পিত্ত ক্ষার অগ্নিদ্বারা দগ্ধ যেই জন,
বমি, অতিসার আর বিষাক্ত যে জন;
স্বেদ অতিযোগ হেতু পীড়িত যাহারা,
রক্তপিত্ত রোগাদিতে স্তম্ভনীয় তারা।
স্তম্ভনীয় যে যে রোগ হইল কথিত।
স্তম্ভন ক্রিয়ায় তাহা হ'বে প্রশমিত॥

গ্রন্থাদি প্রাপ্তি স্বীকার।

পরম বিদ্যোৎসাহী ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল্, এম্, এস্, মহাশয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত চিত্র ও পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন :—

(১) অস্থিভঙ্গ ও সন্ধিবিশ্লেষের ২৪ খানি চিত্র (২) স্বপ্রণীত বৈদ্যকব্যবহার বিদ্যা (Medical Jurisprudence) ১ খানি (৩) সৌদামিনীর প্রসূতি ও ধাত্রীশিক্ষা (৪) মহেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "বাঙ্গালা ফিজিওলজি" ১ খানা (৫) জীবাণু ও রক্ত সম্বন্ধীয় রঞ্জিত চিত্র ১ খানি।

মাঘের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৶০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। টাকাকড়ি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, ৪৬নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসেরমধ্যে না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন; যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। "আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন নচেৎ কাজের বড়ই অসুবিধা হয়।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক পৃষ্ঠা	বা	দুই	কলম	৮৲
,,	আধ ,,	,,	এক	,,	৪॥০
,,	সিকি ,,	,,	আধ	,,	২৸০
,,	অষ্টাংশ ,,	,,	সিকি	,,	১॥০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন
"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন মেশিন প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।
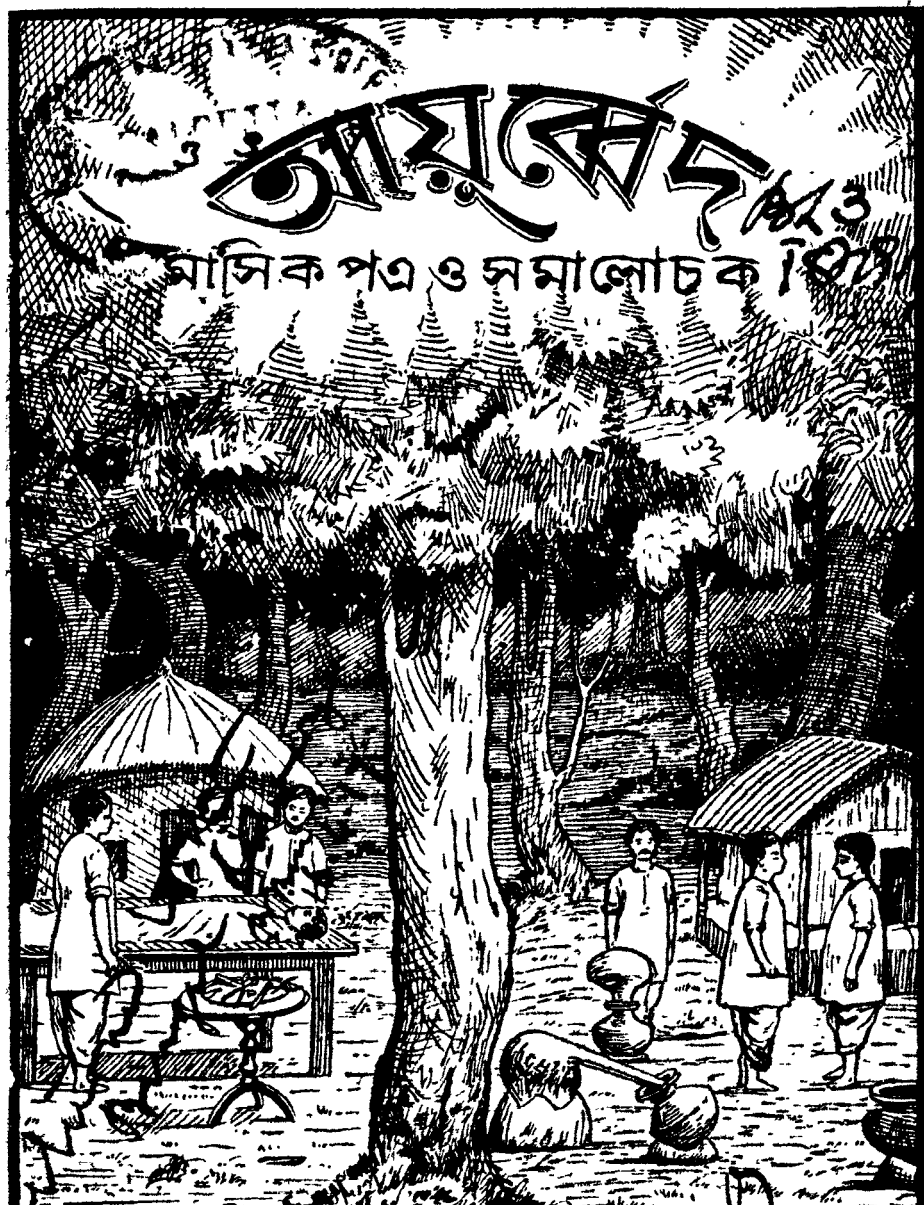
আয়ুর্ব্বেদ
মাসিক পত্র ও সমালোচক
সম্পাদক—
কবিরাজ-শ্রীবিরজা চরণ গুপ্ত কবিভূষণ
" শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন
এম.এ, এম.বি।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, মাশুল ।৵০
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।

দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

আয়ুর্ব্বেদ
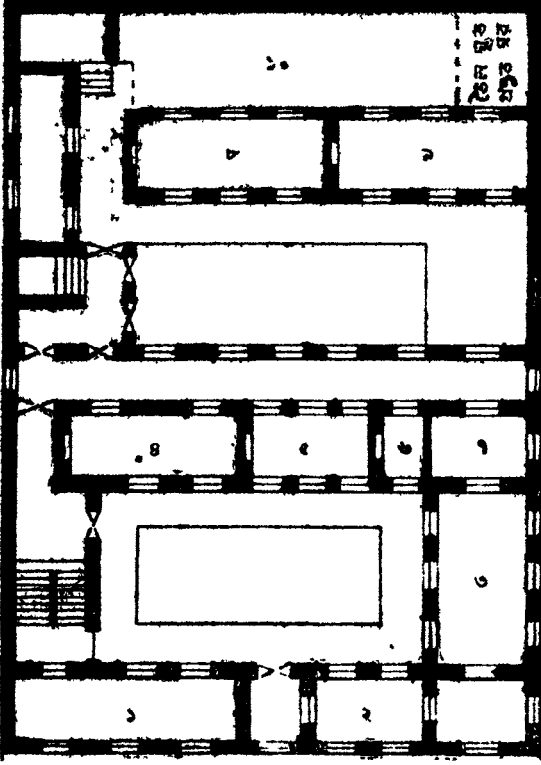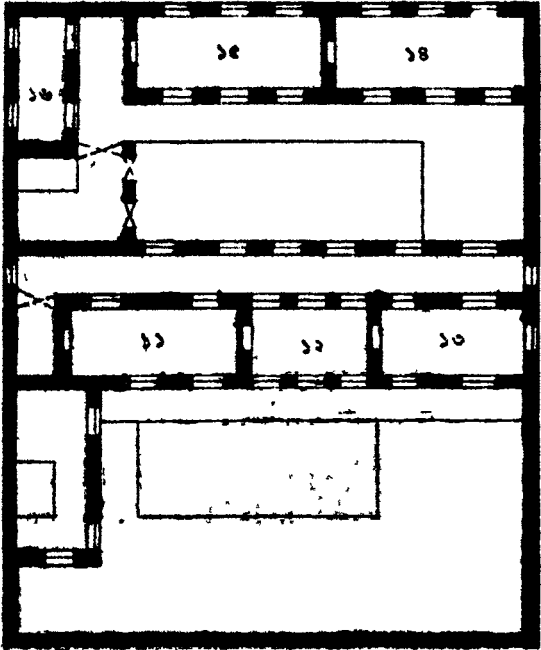
মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৩—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শিশুর তড়কা চিকিৎসা।

ঠাকুরমা ও বড় বৌ।

বড় বৌ। ঠাকরুণত এখানে নেই, ঠাকমা, এদিকে অন্তঃবতী এসে পড়েছে। তা এ সময় কি খাবাব দাবাব যোগাড় কবতে হবে—ব'লে দাও। একটু ত্রুটি হলে তোমাব নাতি আমায় বনবাসে দেবে।

ঠা। সে সত্য ত্রেতা দ্বাপব চোলে গেছে বড়, তোব ভয় নেই। এটা কলি, বনবাসে দেবাব যুগ নয়—'দেহি পদপল্লবমুদাবমে'ব যুগ।

ব। না ঠাকুমা, অন্য বাড়ীতে যা হয় হোক্, কিন্তু এ বাড়ীতে কলি বোধ হয় এখনও ঢুকতে পাবেনি। যে বাড়ীতে নিত্য দেবসেবা অতিথি সেবা হয়, ভিক্ষুক ভিক্ষে না পেয়ে ফেবে না, ছেলেপিলে বউঝি, গুরুজন আব দেবতা বামুনদেব ভক্তি শ্রদ্ধা, বাপমাকে দুবেলা প্রণাম ক'রে সদাচাবে থাকে, যে বাড়ীতে, অখাদ্য কুখাদ্য প্রবেশ করতে পাবে না, একজন আর একজনেব হিংসে করেনা, সেখানে বোধ হয় কলির প্রবেশেব অধিকাব নেই।

ঠা। কথাটা বড় মিথ্যে বলিসনি বউ।

ব। শুধু মিথ্যে বলিনি তা নয় ঠাকমা, সম্পূর্ণ সত্যি বলিছি। কলির প্রাদুর্ভাব হ'লে লোকে অল্পায়ু হয়, অধার্ম্মিক হয়, রোগ ও অকালমৃত্যু ঘটে, পুরুষে স্ত্রীর অনুরক্ত হ'য়ে গুরুজনদেব তাচ্ছিল্য করে, স্ত্রীলোকে কলহ-প্রিয় হয়,—স্বামী ও গুরুজনদেব ভয় ভক্তি কবে না—এই সব হয়ত ঠাকমা।

ঠা। হাঁ, তাই হয় বৈ কি।

ব। কিন্তু দেখ ঠাকমা, এ বাড়ীতে নেহাৎ অল্পদিন আসিনি। যা দেখেছি আর শুনেছি তাতে স্পষ্ট বুঝেছি যে- এ বাড়ীতে সকলে দীর্ঘায়ু, বোগ ও অকালমৃত্যু নেই, অধর্ম্ম প্রবেশ কবে না, ছেলেপিলে বৌঝি পবস্পর হিংসা, দ্বেব বা ঝগড়া করে না, গুরুজনদেব ভক্তি শ্রদ্ধা কবে, তবে কেন বলব না যে এ বাড়ীতে কলি প্রবেশ কবতে পাবে নি ?

ঠা। তোমবা আমাব এক একটী

সোণার চাঁদ। এত চাঁদ যেখানে, সেখানে কি অন্ধকার আসতে পারে ?

ব। সে কথা ব'লে ভোলালে শুনছিনে ঠাকমা। আমরা এখন চাঁদ হয়েছি বটে, কিন্তু সে কোন্ সূর্য্যের আলো পেয়ে — তোমার। আমরা অমানুষ ছিলাম—এখন মানুষ হয়েছি, সে কার শিক্ষায় ?—তোমার। হিংস্র পশু যেমন তপোবনে গেলে হিংসা ভুলে গিয়ে শান্ত শিষ্ট নিরীহ হয়, আমরা তেমনি তোমার তপস্যার স্থলে এই বাড়ীতে এসে শান্ত শিষ্ট হয়েছি।

ঠা। আমার করবার কি সাধ্যি, করবার কর্ত্তা সেই ভগবান।

ব। তাত বটেই, কিন্তু একটা উপলক্ষ্য চাই। তা তুমিই হলে সেই উপলক্ষ। আমাদের বাড়ীত আগাগোড়া সমান টানে চল্‌ছে, কিন্তু ঠাকুরঝিদের বাড়ীর কি পরিবর্ত্তনই না ঘটেছে !

ঠা। হাঁ, ওদের বাড়ীর সকলেই সাহেবীয়ানা ছেড়ে এখন পুরো হিঁদু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ব। আচ্ছা ঠাকমা, এমন হয় কেন ? লোকে যখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে যে—প্রকৃত হিঁদুয়ানী-চালে চল্‌লে রোগ, শোক, অকাল মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আর সুখ শান্তি আসে, তখন সাহেবীয়ানা চালে চলে কেন ?

ঠা। কালের ধর্ম্ম বৈ আর কি বল্‌বো ? কালের ধর্ম্মে লোকের বিপরীত বুদ্ধি আসে। বিপদ হবার সময় হলেই এই রকম ঘটে। সোণার হরিণ কখন হয় না, কিন্তু তবু সোণার হরিণ দেখে রামচন্দ্র লোভ করেছিলেন। বিপদ আসন্ন হলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিও লোপ পায়। আমাদের দেশের এখন তাই ঘটেছে। তবে সাহেবীয়ানাকে মন্দ ব'লে ভাবা তোমার একটা মস্ত ভুল। সাহেবদের পক্ষে সাহেবীয়ানাই ভাল। বিলেতের মত শীতের দেশে পাতলা কাপড় গায়ে দিয়ে, আর আলোচাল কাঁচকলা ডাব খেয়ে তারা বেশী দিন বাঁচতে পারে না। তাদের গরম কাপড়, চা, মদ, মাংসই দরকার। তবে আমাদের দেশের লোক বিলিতী চালে চল্‌লে ভাল থাকে না। আর বরং পুরো সাহেবী ভাল, কিন্তু অনেকেই দু নৌকায় পা দেয়, আধা সাহেব, আধা হিঁদু।

ব। আচ্ছা ঠাকমা, সাহেবরা ত এদেশে সাহেবী চালে চলে, তবে তাদের শরীর খারাপ হয় না কেন ?

ব। খারাপ হয় না কে বল্‌বে ? ওরা এই গরম দেশে এসে জ্যান্তে মরা হয়ে থাকে। কিন্তু কি কর্‌বে—পেটের দায়। তবে অনেক সাহেবই তাজা হবার জন্যে মধ্যে মধ্যে বিলেত যায়, আর অসুখ হলেত যায়ই।

(ছোট বৌয়ের প্রবেশ)

ছো। কি বড়দি, তুমি এখনও এইখানে বসে আছ ?

ব। ঐ দেখ ভাই, ঠাকমার কাছে এলে আর কাজ কর্ম্ম কিছুই মনে থাকে না। হাঁ ঠাকমা, অম্বুবতীর (অম্বুবাচী) কি যোগাড় করবো বল ?

ঠা। যা হয় করগে না, আমার খাবার দিন ফুরিয়ে গেছে।

ব। আমি বলি—যে বেশ করে ময়ান দিয়ে লুচি ভেজে রাখি, কিছু তরকারী আর সন্দেশ তৈয়ের করে রাখি।

ঠা। অম্বুবতীতে কি পাক করা জিনিষ খেতে আছে ?

র। অন্তঃসত্ত্বার সময় পাক করবো কেন, আগে তৈয়ের করে রাখবো। অনেকেই ত তাই করে—দেখেছি।

ঠা। তারা শাস্তরকে ফাঁকি দেয়। অন্তঃসত্ত্বার সময় পাক করা জিনিষই খেতে নাই। কিছু ফল মূল কাঁচা দুধ—এই সব হলেই চলবে।

ব। চিনি, মিছরি কি গুড়—কিছু মিষ্টি চাইনে?

ঠা। ও সব যে পাক করা জিনিষ। তবে ভাল মধু পাওয়া যায়ত দেখিস্।

(লীলার প্রবেশ)

ঠা। এই যে লীলা এয়েছিস্। আয়—বোস্।

লী। বস্‌বো কি ঠাকুমা, আমি বড় বিপদে পড়িছি।

ঠা। কেন আবার তোর কি হল?

লী। আমার সেই ছোট মেয়েটার খুব জ্বর, কালত যায় যায় হয়েছিল। হাত মুঠো বেঁধে, হাত পা শক্ত করে, চক্ষু কপালে তুলে কেমন কোর্‌তে লাগল।

ঠা। ও, তড়কা হয়েছিল। তা ভয় নেই, একটু বেশী জ্বর হলেই কচি ছেলে পিলের ও রকম হয়ে থাকে। ও রকম ভাব ভাল হয়ে যাবার পর বেশ চাঙ্গা হয়েছিল ত?

লী। হাঁ, ২।৩ ঘণ্টা বাদে জ্বর কমে গেলে বেশ খেলা করতে লাগল,—হাঁসতে লাগল।

ঠা। তা হলে ভাবনা নেই, ভাল হয়ে যাবে।

লী। আমার কিন্তু বালকের ব্যাপার দেখে বড় ভয় হয়েছে ঠাকুমা। যাতে ও রকম আর না হয়, তার উপায় করে দাও। আর হলেই বা কি করব,— তা বল।

ঠা। জ্বর বেশী হ'লেই ওরকম হয়। কাজেই জ্বর কমাতে না পারলে তড়কা হবার ভয় ঘুচবে না। জ্বর কমাবার কথা পরে বলছি, আগে তড়কা যাতে না হয় আর হলেই বা কি করা উচিত সে কথা বলি, তা বোস্ না তুই।

লী। তা বস্‌ছি। আমার আর বসা দাঁড়ান মনে নেই ঠাকুমা, তুমি বল এখন।

ঠা। একটু বেশী জ্বর হলেই দেখ্‌বি, ছেলে মুঠো বাঁধছে কিনা আর চোখ কপালের দিকে তুলেছে কি না। যদি সে রকম করছে দেখতে পাস্ তা হ'লে তখনি একটু অডিকলমে জল মিশিয়ে দুধের মত তাতে নেকড়া ভিজিয়ে কপালে পটী দিবি, পটী যেন শুকিয়ে না যায়—একটু একটু অডিকলম দিয়ে ভিজে রাখবি, আর মাথায় পাখার বাতাস করবি।

লী। তা অডিকলম ত অনেক রকম আছে—যে কোন অডিকলম দিলে চলবে?

ঠা। এক রকম সরু লম্বা শিশি ক'রে যে অডিকলম বিক্রী হয়, তাকে পাইভায়ের অডিকলম বলে। সেই গুলো খুব ভালো। তা যদি না পাও—তা হলে অন্য ভাল অডিকলমও দেওয়া যেতে পারে।

লী। আচ্ছা, অডিকলম যদি না পাওয়া যায়?

ঠা। তা হলে সোরা আর নিশাদল জলে দিলে জল বেশ ঠাণ্ডা হয়। সেই জলের পটী দিলে চলে।

লী। নিশাদল কোথায় পাওয়া যায়?

ঠা। ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, বেণের দোকানে পাওয়া যায়, আর শেকরাদের কাজে নিশাদল লাগে ব'লে তাদের কাছেও থাকে।

লী। আর কিছু দেওয়া চলে না?

ঠা। শাদা কি লাল চন্দন ঘষে কপালে

লেপে দিলেও চলে। শুকিয়ে গেলে তুলে ফেলে আবার টাট্‌কা চন্দন লেপে দিতে হয়। যাই দাও মাথায় কিন্তু পাখার বাতাস দেওয়া চাই।

নী। আর যদি হয় তা হলে কি করতে হবে?

ঠা। হবার মুখে এ রকম করলে আর তড়কা হতে পায় না। হলেও এ রকম করলে ভাল হয়ে যায়।

নী। আচ্ছা ঠাকুমা, তড়কা কি একবার হয়েই ভাল হয়ে যায়?

ঠা। তার মানে নেই। যদি আর বেশী জ্বর না হয়, তা হলে একবার হয়েই ভাল হয়ে যেতে পারে। যদি আবার বেশী জ্বর হয়—আবার হতে পারে। একবারকার জ্বরেই বার বার হতে পারে, আর এইটেই খারাপ বেশী।

নী। তা যে সব উপায় বললে, তাতে যদি ভাল না হয়, তা হলে কি করবো?

ঠা। প্রায়ই এই সব উপায়ে ভাল হয়ে যায়। তবে যদি কিছুতেই ভাল না হয়ে অনেকক্ষণ থাকে, তা হলে বরণের আঙটি পুড়িয়ে কপালে ছেঁকা দিতে হয়।

নী। বরণের আঙটি ভিন্ন আর কিছুতেই হয় না?

ঠা। হবে না কেন ছেঁকা দেওয়া যখন উদ্দেশ্য তখন একটা চাবির গোল মুখটা বা অন্য কিছু ঐ রকম ছোট জিনিষ গরম করে ছেঁকা দেওয়া যেতে পারে। কচি ছেলের কপালে ছেঁকা দিতে হবে, তাই পাছে কেউ কোন বড় জিনিষ দিয়ে ছেঁকা দেয়, এজন্য বরণের আঙটী দিয়ে দেবার নিয়ম হয়েছে।

নী। এতেও যদি ভাল না হয়?

ঠা। এতে ভাল না হ'লে জীবনের আশা কম। তবে আজ কাল আর একটা উপায় হয়েছে, আর সেটা ডাক্তারী কবিরাজী উভয় মত সম্মত চিকিৎসাও বটে। তবে আগে যখন তখন বরফ পাওয়া যে'ত না বলে দেওয়া হত না। ডাক্তারের একরকম রবারের থলের ভেতর বরফ রেখে মাথায় দেয়। তা থলে না পাওয়া গেলে কচু পাতা কি কলা পাতায় বরফ বেখেও মাথায় দেওয়া চলে। এতে জল শোষে না অথচ মাথায় ঠাণ্ডা লাগে।

নী। তা একে কচি ছেলে—তাতে এত ঠাণ্ডা লাগলে অসুখ বেড়ে যেতে পারে ত?

ঠা। যেখানে শ্লেষ্মার দোষ প্রবল সেই খানে ঠাণ্ডা লাগার ভয় বেশী। কিন্তু শ্লেষ্মা শরীরে বেশী থাকলে জ্বরের উত্তাপ খুব বেশী হয় না। পৈত্তিক কি বাত পৈত্তিক জ্বরেই গায়ের উত্তাপ খুব বেশী হয়। এতে ঠাণ্ডা লাগলে ক্ষতি হয় না। আর এক কথা—ঠাণ্ডা না লাগালে যখন প্রাণরক্ষা হয় না, তখন সে সময় তাই করেই প্রাণ রক্ষা করা উচিত।

নী। আচ্ছা ঠাকুমা, কবিরাজীতে জ্বরে ঠাণ্ডা করিবার নিয়ম আছে বল্‌লে, কিন্তু কোন কবিরাজকে তা করতে দেখিনি।

ঠা। লোকনাথ বদ্দি বলতেন—দেখ বড় গিন্নি, নূতন পিত্ত জ্বরে ঠাণ্ডা করবার কথা স্পষ্ট লেখা আছে* কিন্তু টীকাকার অন্য জায়গায় একটা বচন তুলে দেখিয়েছেন যে—নবজ্বরে ঠাণ্ডা করতে নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে তবে এটা নূতন পিত্তজ্বরে নয়—পুরাতন পিত্তজ্বরে। এমনি করে আমাদের দেশ থেকে এ সব বিষয় গোলমাল হ'য়ে পড়েছে।

* চক্রদত্ত—জ্বরচিকিৎসা, ৮৫।

লী। ডাক্তারেরা কি জ্বরে ঠাণ্ডা করে ?

ঠা। হাঁ খুব করে, যেখানে জ্বরের উত্তাপ ভয়ঙ্কর হ'য়ে রোগী মারা যাবার উপক্রম হয়, সেখানে ঠাণ্ডা করা ছাড়া আর উপায় নেই। দু এক রকম ডাক্তারী ওষুধ আছে, যা খাওয়ালে জ্বর কমে যায়, কিন্তু একটু পরে যে কে সেই। তাই এখন জ্বরের তাত খুব বেশী হ'লে ডাক্তারেরা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে আর মাথায় মোটা কাপড় জড়ায়, কেবল মুখটি বাদ রাখে। আর বরফ জল কি খুব ঠাণ্ডা পাতকো'র জল দিয়ে সেই কাপড়খানি ভিজিয়ে রাখে। এই রকম ভাবে ১৫।২০ মিনিট রেখে জ্বরের তাত কমে গেলে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বেশ করে মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখে।

ঠা। জ্বর কেন হ'ল—বলতে পারিস ?

লী। তাত বলতে পারিনে ঠাক্‌মা, তবে জ্বর হবার দু দিন পূর্ব্বে আমি নিজে তাকে খাওয়াইনি। আমার ঝি তাকে খেতে দিত।

ঠা তা হলে খাওয়ার দোষেই হয়েছে। কচি ছেলে পিলের প্রায় খাওয়ার দোষেই জ্বর হয়। এ দুদিন বাহ্যে কেমন হচ্চে ?

লী। রোজ ২।৩ বার পরিষ্কার বাহ্যে হয়, কিন্তু এ দিন একবার করে সামান্য একটু বাহ্যে করেছে।

ঠা। পেটটা দেখেছিস্ ?

লী। হাঁ, দেখেছি। পেটটা একটু ফাঁপা আর পেটের ভেতর গড় গড় করে শব্দ হচ্চে।

ঠা। তা হলে ঠিক হয়েচে ! খাওয়ার দোষেই বটে। খেতে কেমন চায় ?

লী। এখন থেকে বড় চায় না।

ঠা। তা হ'লে খেতে খুব কম দিস্। পিপুলের সঙ্গে দুধ সিদ্ধ ক'রে সেই দুধে জল মিশিয়ে সাগু সিদ্ধ ক'রে গরম গরম খাওয়াবি। যেন ২ ভাগ দুধ আর এক ভাগ জল থাকে। বার্লি কাপড়ে ছেঁকে দিস্। আর মিছরী না দিয়ে নুণ নেবুর রস দিয়ে দিলেই ভাল হয়। পেটটা ভাল হলেই জ্বর সেরে যাবে।

লী। কতটুকু দুধ দেব ?

ঠা। যখন খিদে নেই বলচিস্ তখন এক পো পাঁচ ছটাকের বেশী দিস্‌নে।

লী। আর কিছু খেতে দেব না ?

ঠা। কচি মেয়ে আর কি দিবি, একটু বেদানার রস দিস। আর মধ্যে ২।৩ ঝিনুক গরম জল দিস্।

লী। ওষুদ কি দেব ?

ঠা। খাঁড়ি নুন বলে এক রকম নুন বেনের দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়। সেই নুন গুঁড়িয়ে এক আনাভর সকালে আর এক আনা ভর বিকালে দিস্।

লী। আর কিছু দেব না ?

ঠা। যদি আর দেবার দরকার হয়, তবে শিউলী পা'া কি বেলপাতার রস একবার চা চামচের এক চামচে—এই ৬০ ফোটা আন্দাজ দিস্।

লী। আর কিছু কর্‌তে হবে না ?

ঠা। না, আর কিছু করতে হবে ন'। তবে তোমায় খুব ধরা কাটায় থাক্‌তে হচ্চে, পুরান চালের ভাত আর মাছের ঝোল ছাড়া আর কিছু খেয়ো না।

লী। আমি খুব ধরা কাটায় থাকবো, আমায় কিছু বল্‌তে হবে না। দরকার হ'লে আবার আস্‌ব। এখন আসি ঠাক্‌মা, মনটা ছেলেটার ওপর পড়ে রয়েছে।

ঠা। তা থাক্‌বে বৈকি ভাই, ছেলের অসুখ হলে মার প্রাণ যে কি করে—তা মাই জানে। ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে।

(লীলার প্রস্থান)

বাধক রোগ চিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২৪ পৃষ্ঠার পর।)

ঠা। ছেলে মেয়েদের ভার যতদূর পারিস্ ঝি-চাকরের হাতে দিস্ তার পর তোমার শাশুড়ী ননদেরাও কতক দেখতে পারবেন, নেহাৎ যেটুকু নইলে নয়, ততটুকু করবি।

ম। আচ্ছা, তাই করবো।

ঠা। হ্যা তাই করিস্। ছোট খোকা কি মাই খায়?

ম। মাইয়েতে দুধ বড় নেই, এক আধ-বার টানে।

ঠা। তোর গায়ে যে রকম রক্ত নেই, তাতে ছেলেকে মাই না দেওয়াই ভাল। মাইয়ের দুধও গায়ের রক্ত কিনা, তবে নেহাৎ না রাখতে পারিস্ ত এক একবার দিস্।

ম। আচ্ছা—স্নান কি রকম করবো ঠাকুমা?

ঠা। এ রোগে অবগাহন-স্নানই ভাল, আর রোজ স্নান করাও চলে। কিন্তু একে তোর শরীর কাহিল, তাতে পশ্চিমের জল ছেড়ে এদেশের জলে নাইতে হবে; কাজেই শরীরের অবস্থা বুঝে কলের জল ধরে খানিক ক্ষণ রৌদ্রে রেখে তার পর স্নান করবি। স্নান ঘরের মধ্যে, আর অল্পক্ষণ ধরে করিস্। কি জানি ঠাণ্ডা লেগে আবার জ্বর ফর হয়ে পড়বে! স্নান করতে ইচ্ছে না হ'লে, শরীর ম্যাজ্ ম্যাজে কি ভার ভার হলে স্নান না করাই ভাল।

ম। আচ্ছা, যে রকম বল্লে, সেই রকম করবো। এখন ওষুদ পথ্যির ব্যবস্থা কি হবে বল?

ঠা। আগে পথ্যির কথা বলি। বেশ খিদে হলে দু বেলাই পুরাণ চালের ভাত খাবি, আর দুবেলা ভাত সহ্য না হলে এক বেলা ভাত আর রাত্রে খৈ দুধ কি দুধ বার্লি খাবি।

ম। আমার কিন্তু পশ্চিমে থেকে রাত্রে রুটী খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে ঠাকুমা!

ঠা। তা এদেশে তেমন ময়দা কি আটাও পাওয়া যায় না, আর রুটী তুমি হজম করতেও পারবে বলে বোধ হয় না। খিদে কেমন হয় বল দেখি?

ম। সকালে তবু একটু হয়,—রাত্রে সে না হওয়ার মধ্যে।

ঠা। তা হ'লে যদি ইচ্ছে হয়, আর সহ্য হয়, তা হলে ভাত খাবি, নয়ত খৈ দুধ কি দুধ বার্লি খাবি। আর নেহাৎ যদি খোট্টানি হয়ে থাকিস, তা হ'লে যবের রুটী, বার্লির রুটী কি সুজির রুটী খাবি।

ম। তরকারী টরকারী কি খাব?

ঠা। হা দেখ—যদি খৈ দুধ খাস্, তা হলে যে রকম বল্‌ছি এই রকম করে খেলে আহার ওষুদ দুই হবে। এক ছটাক কিস্‌মিস্ দুসের জলে সিদ্ধ ক'রে দেড়পো আধসের থাক্‌তে নামাবি। নামিয়ে ছেঁকে তাইতে খৈয়ের গুড়ো তোলা চারেক, একটু চিনি আর একটু মধু মিশিয়ে খাবি।

ম। ওর সঙ্গে দুধ খাওয়া যায় না?

ঠা। যাবে না কেন? তা হ'লে দুধ দেড়পো কি আধ সের—আর বাকী জল দিয়ে দুসের

ক'রে তার সঙ্গে কিস্‌মিস্‌ সিদ্ধ করে নিবি। তবে দুধ দিলে সেটা গরম গরম খেতে হবে, আর তার সঙ্গে মধু দেওয়া চল্‌বে না।

লী। কেন ঠাক্‌মা, গরম জিনিষের সঙ্গে কি মধু খেতে নেই?

ঠা। গরম জিনিষের সঙ্গে—কি গরম করে—মধু ত খেতেই নেই; তা ছাড়া শরীরে গরম সেক তাপ দেওয়ার পরেও মধু খেতে নেই। গরম জিনিষের সংসর্গে এলে মধু বিষ হয়।

ম। তার পর তরকারীর কথা বল।

ঠা। তরকারীর মধ্যে নটশাক, কাঁচড়া শাক, মোচা, কচি কাঁচকলা, মান, থোড়, পটোল, পাকা দেশী কুমড়ো, ডুমুর, লাউ, কাঁচা পেঁপে—এই সব খেতে পার। আলুটা না খাওয়াই ভাল, কিন্তু আলুটা এত চল্‌তি হয়েছে যে—আলু বাদ দিয়ে তরকারী রান্নাই হয় না, সেই জন্যে একটু আধটু আলু খেতে বলতেই হয়।

ম। দালের মধ্যে কি খাওয়া যায়?

ঠা। দালের মধ্যে মুগ, মসুর, অড়হর ও ছোলার দালের যূষ। মনে রেখ—দাল নয় দালের যূষ। দাল এখন হজম হবে না। তবে যূষ আলাদা করে করতে হবে না, গেরোস্তোর যে দাল রান্না হবে, তাই থেকে দাল গুলো নিংড়ে ফেলে দিলেই হবে। কিন্তু দালে, শুধু দালে নয় তুমি যে তরকারী খাবে তাতে, লঙ্কা কি সরষে বাটা দেওয়া না হয়। গুড়ের বদলে চিনি আর সরষের তেলের বদলে ঘি দিয়ে রাঁধা উচিত। অন্ত নুণ ব্যবহার না করে সন্ধব নুণ ব্যবহার করা দরকার।

ম। মাছ মাংস কিছু খাওয়া যায় না?

ঠা। মাছ এরোগে বড় ভাল নয়, কেবল 'চিংড়ি' আর 'বান মাছ' খাওয়ার নিয়ম আছে। তবে বাংলা দেশের লোকের মাছ একটা প্রধান আহার—তা না হয়, খল্‌সে, কৈ, কি মাগুর মাছের ঝোল খাস্‌, কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি—মাছ দুধ এক বেলায় খাসনে। যে বেলায় মাছ খাবি—সে বেলায় দুধ খাবিনে, যে বেলায় দুধ খাবি—সে বেলায় মাছ খাবিনে। আর খুব কম খাবি, বরং মাছের ঝোলটা খাস্‌।

ম। মাংস খাওয়া যায়।

ঠা। শশক, ঘুঘু, হরিণ, পায়রা, ভেড়া—এই সকলের মাংস খাওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু তুমিত এখন মাংস হজম করতে পারবে না। তবে শরীর যে রকম তাতে মাংসের যূষ ক'রে খেতে পার্‌লে ভাল হয়।

ম। ঘি খেতে পারব?

ঠা। একটু একটু ঘি খেতে পার। তবে এখন কাঁচা ঘি না খেয়ে তরকারীতে দিয়ে কি দু একখানা ফুলকো লুচি খেতে পার। তার পর কচি তালশাঁস, ডাব নারকেলের শাঁস, দাড়িম, খেজুর, কেশুর, পানফল, কিস্‌মিস্‌, মিছরী, আক—এই সব জিনিষ জল খাবার খেতে পার। তবে একটা কথা বলে রাখি—তোমার শরীর দুর্ব্বল ব'লে যেমন কিছু পুষ্টিকর জিনিষ খাওয়া দরকার, তেমনি খাবার যাতে হজম হয়—সে দিকে লক্ষ্য রাখাও দরকার। হজম হলে থৈ খেয়েও বল হয়, আর হজম না হ'লে কালিয়া পোলাও খেয়েও বল হয় না। বরং জ্বর, পেটের অসুখ, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মাবার সম্ভাবনা।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, এ রোগে পথ্যির কথাত বললে, কুপথ্যি কি তা বলনা—শিখে রাখি:

ঠা। বলছি শোন। পরিশ্রম, পথচলা, রৌদ্র লাগান, শরীর নাড়াচাড়া করা, গাড়ী-

চড়া, বাহ্যে প্রস্রাবের বেগ এলে বাহ্যে প্রস্রাব না করা—এই সব ভাল নয়। তার পর গুড়, কুলথি, বেগুণ, তিল, মাষকলায়, সরষে, দৈ, পান, শিম, রশুন, টক জিনিষ, ঝাল জিনিষ, মুণ, ভাজাপোড়া, ক্ষার জিনিষ পাতকো'র জল—এসব খেতে নেই।

ম। আচ্ছা ঠাকুমা, এখন ওষুদের কথা বল।

ঠা। তোমাকে বড় ওষুদ না দিলে হবে না। তবে লীলা শিখবে বলেছে—তাই কতক গুলো ছোট ছোট মুষ্টিযোগ বলছি। রোগের প্রথম অবস্থায় কি সামান্য রোগে এই ওষুদ দিলে কাজ হয়।

(১) কুশের মূল আধতোলা চেলেনী জলের সঙ্গে বেটে তিন দিন খেলে রোগ ভাল হয়।

(২) শ্বেত বেড়েলার মূল আধতোলা দুধে বেটে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে একটু মধু দিয়ে খেলে রক্তপ্রদর ভাল হয়।

(৩) মোচার ভেতর যে কলা থাকে—সেই কলা শুকিয়ে গুঁড়িয়ে এক সিকি থেকে আধ তোলা মাত্রায় দুধের সঙ্গে খেলে ভাল হয়।

(৪) ডুমুরের রস আধ তোলা থেকে এক তোলা মাত্রায় মধু মিশিয়ে খেয়ে চিনি আর দুধের সঙ্গে ভাত খেলে রক্তপ্রদর ভাল হয়।

ম। এখন আমাকে কি বড় ওষুদ দেবে বল?

ঠা। বড় ওষুদ অশোক ছাল। অশোক ছালের মত রক্ত প্রদরের একটা ভাল ওষুদ নেই বললেই হয়।

ম। অশোক ছাল কি করে খেতে হবে?

ঠা। প্রথমে একটা পাচন ব্যবহার কর। অশোকছাল, বাসকছাল, রক্ত কমলের মূল আর দারুহরিদ্রা প্রত্যেক আধ তোলা হিসাবে দু তোলা নিয়ে থেঁতো করে আধসের জল দিয়ে সিদ্ধ করবি। তার পর আধ পোয়া থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে খাবি। এটা ৩।৪ দিন ব্যবহার করলে যত প্রবল রক্তস্রাবই হ'ক, কমে যায়। কিন্তু এসব রোগে দোষ হয় এই যে—রক্ত একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে রোগীর বড় যন্ত্রণা হয়। আবার যতক্ষণ রক্ত না ভাঙ্গে, ততক্ষণ শরীর সুস্থ হয় না।

লী। রক্ত প্রদর-রোগ মাত্রেই কি এরকম হয়?

ঠা। না, তা হয় না। নূতন রোগেও হয় না, মাঝামাঝি রোগেও অনেক সময় হয় না, তবে পুরাণ রোগে অনেক সময় এ রকম হতে দেখা যায়।

ম। তা এরকম হলে কি করবো?

ঠা। ৩।৪ দিন ঐ রকম পাচন খাবার পর যদি দেখিস্ যে রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে, তা হ'লে পাচন বন্ধ করে দিবি। আর আগে যে মুষ্টিযোগ বলেছি তার কোন মুষ্টিযোগ কি কেবল অশোকছাল দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে খাবি।

ম। অশোকছাল দুধের সঙ্গে কি ক'রে সিদ্ধ করবো?

ঠা। দু তোলা অশোক ছাল থেঁতো, ষোল তোলা দুধ আর ৬৪ তোলা জল ক'রে একসঙ্গে সিদ্ধ করবি। জল মরে গেলে, যখন কেবল দুধ ১৬ তোলা থাকবে, তখন নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে খাবি। ফল কথা—এটা যেন মনে থাকে যে—এই ওষুদগুলো রক্তস্রাব বন্ধ হবার ওষুদ। কোনটা বেশী রক্ত রোধক, কোনটা

কম। কিন্তু আমাদের এমন ওষুদ এমন মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে যে—রক্তস্রাব যেন একেবারে বন্ধ না হয়, অথচ বেশী স্রাব না হয়। এই মনে কর—অশোকছাল দু তোলা দিলে যদি রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা হয়, তা হলে অশোক ছাল ২ তোলা না নিয়ে এক তোলা নিবি।

নী। তাতে জল দুধ কি আগেকার মতন নিতে হবে?

ঠা। না, বলি শোন।—দুধের সঙ্গে ওষুদ পাক ক'রে খাওয়াকে কবিরাজীতে 'ক্ষীর পাক' বলে। এর নিয়ম হচ্চে এই—ওষুদ যতটা হবে, দুধ তার আটগুণ, আর জল দুধের চার-গুণ দিয়ে পাক ক'রে দুগ্ধ শেষ থাকতে নামিয়ে নিতে হয়। তা এক তোলা অশোক ছাল নিলে দুধ ৮ তোলা আর জল ৩২ তোলা একত্র পাক ক'রে ৮ তোলা থাকতে নামিয়ে নিতে হবে।

ম। তার পর?

ঠা। তার পর আর কিছু নেই, এতেই অসুখ সেরে যাবে। রক্তস্রাব বেশী হলেই ঐ পাচনটা ব্যবহার করবি। আর খুব ক'মে গেলে অশোক ছাল দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে কিম্বা একটা মুষ্টি যোগ ব্যবহার করবি। পাচনটা অর্দ্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করলেও চলে।

ম। পাচন অর্দ্ধেক মাত্রায় ব্যবহার করতে হ'লে কি করে তৈয়ার করবো?

ঠা। তৈয়ার পুরো মাত্রায় করতে হবে। তার পর অর্দ্ধেক খেতে হবে, আর অর্দ্ধেক ফেলে দিতে হবে।

নী। আচ্ছা ঠাকুমা, দারুহরিদ্রাত জানি—এক রকম হলদে কাঠ,—বেনের দোকানে পাওয়া যায়। কিন্তু রক্ত কমলের মূলটা কি?

ঠা। রাঙ্গা পদ্ম ফুলের গোড়ায় কাদার ভেতর যে গেঁড় থাকে, তাকেই রক্তকমলের মূল বলে।

নী। ঠাকুমা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। আচ্ছা—মুষ্টি মানেত কিল—আর যোগ মানে লাগান। তা মুষ্টিযোগ দিলে ওষুদ খাইয়ে রোগীকে খুব কিলুতে হয় নাকি?

ম। যদি তা হয় ঠাকুমা, তা হলে তোমার মুষ্টিযোগ আমার পক্ষে মারাত্মক হবে। এ শরীরে বেশী কিল সইবে না।

ঠা। কিল খাবার এত ভয়! কাঁটাল খেতে গেলেই মুখে আঠা লাগে—সেটা আগে ভাবতে হয়। যাক্ তোর ভয় নেই। মুষ্টি মানে মুটো, এক মুটো ওষুদ নেবার নিয়ম ছিল ব'লে মুষ্টিযোগ নাম হয়েছে।

নী। তা তুমিত একমুটো নিতে বল্লে না?

ঠা। এখনকার ক্ষীণপ্রাণ লোক কি আর অত বেশী মাত্রা সহ্য করতে পারে।

ম। আচ্ছা ঠাকুমা, সবত হ'ল। এখন এই মাথা ঘোরা আর বুক ধড়ফড়ানিটে যাতে কমে, তার একটা উপায় কর।

ঠা। একটু শরীরে বল হ'লে ওগুলো আপনি যাবে। তবে এখন মাথায় তিলের তেল দিস্—কি একটু ষড়বিন্দু তেল কিনে এনে মালিষ করিস। আর ১ তোলা শালপানি—ক্ষীরপাকের নিয়মে দুধের সঙ্গে পাক ক'রে খাস্, তা হ'লে বুক ধড়ফড়ানি কমে যাবে. তবে শরীরে একটু রক্ত না হ'লে একেবারে যাবে না।

নী। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি ত বল যে সব রোগেই বায়ু, পিত্ত, কফের দরুণ অবস্থা আলাদা হয়? তা এ রোগে কি সে রকম হয় না?

ঠা। হয় বৈকি। তবে শোন ব'লি।—বাতিক প্রদরে রুক্ষ, ফেনা ফেনা, অরুণবর্ণ, অল্প অল্প রক্ত যন্ত্রণার সহিত নির্গত হয়। পৈত্তিক প্রদরে পীত নীল কি কৃষ্ণবর্ণ গরম রক্ত খুব বেগে নির্গত হয়, আর পিত্তের উপসর্গ হাতপা গা জ্বালা থাকে। কফপ্রদরে আটার মত পিচ্ছল পাণ্ডুবর্ণ বা মাংস ধোয়া জলের ন্যায় স্রাব হয়।

লী। তা ওষুধ ত আলাদা আলাদা বল নি ?

ঠা। সব রোগে ওষুদ সম্বন্ধে সেটা আবশ্যক হয় না। এই মনে কর—খয়ের কুষ্ঠ রোগ নষ্ট করে। তা বায়ু, পিত্ত, কফ যে দোষই বেশী থাক্ না কেন, সকল অবস্থা-তেই খয়ের প্রয়োগ করা চলে। এই রোগের যে সব ওষুদ বলেছি, সেগুলোও তেমনি সব অবস্থায় প্রয়োগ করা চলে।

লী। তা তুমি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার দু একটা মুষ্টিযোগ বল,—শিখে রাখি।

ঠা। আচ্ছা তবে বলি শোন। (১) সচললবণ, কালজীরে, যষ্টিমধু, নীল সুদি—প্রত্যেক জিনিষ এক আনা বেশ করে বেটে কি গুঁড়ো ক'রে আধ ছটাক আন্দাজ দই বা এক সিকি ভরি মধুর সঙ্গে খেলে বাতিক প্রদর ভাল হয়। (২) বাসক কি গুলঞ্চের রস ২ তোলা, আধ তোলা চিনি আর এক সিকি মধু মিশিয়ে খেলে পৈত্তিক প্রদর ভাল হয়। (৩) রোহিতক রয়না বা রেড়া গাছের মূলের কাঁচা ছাল ১ তোলা, কি আমলকীর বীচির শাঁস এক সিকি বেটে, চিনি আর মধু মিশিয়ে খেলে কফজ প্রদর ভাল হয়। (৪) কাপাসের মূল আধ তোলা চেলুনী জলের সঙ্গে বেটে খেলে ভাল হয়।

লী। যাক্, এ বিদ্যেটা এক রকম শেখা হল।

ম। (চুপে চুপে লীলার প্রতি) বাধকের বেদনার সময় বেদনা কমবার কোন উপায় আছে কিনা—জিজ্ঞাসা কর্ না বৌদি ?

লী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুল হয়েছে ঠাকমা, ঠাকুর ঝির যখন বাধকের বেদনা ধরে, তখন কি করে সেটা কমান যায় ?

ঠা। রক্তটা যতক্ষণ না ভাঙ্গে, ততক্ষণ যাতনা হয়; ভেঙ্গে গেলে যাতনা কম হয়। তলপেটে সেক দিলে রক্তটা বেরিয়ে যায়। তা এক কাজ করিস,—একটা বোতলে গরম জল পুরে মুখে বেশ ক'রে ছিপি বন্ধ ক'রে তাই দিয়ে তলপেটে নাইয়ের একটু নীচে সেক দিস্।

লী। তা এত গরম সইবে কেন ?

ঠা। না সয়, বোতলের উপর দু এক পুরু কি যতটা আবশ্যক কাপড় জড়িয়ে নিস্।

লী। আর কোন উপায়ে তাত দেওয়া যায় না ?

ঠা। গমের ভুষির পুলটীস্ দিলেও চলে। ভুষি বেশ করে বেটে গরম ক'রে একটা নেকড়ার আধখানায় মাখিয়ে আর আধখানা দিয়ে ঢেকে দিবি। আর সেই পুলটীশ তল-পেটে বসিয়ে দিবি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সেটা বদ্‌লে আবার নূতন করে দিবি।

ম। আমায় আর কিছু বলবার নেই ঠাকমা।

ঠা। না আর কিছু বলবার নেই। এই রকম করগে যা, তাইতে অসুখ ভাল হয়ে যাবে। এখন তোরা আমায় ছুটি দে। আমার পুজো আহ্নিক করবার সময় হয়েছে।

লী। তবে তুমি এস ঠাকুমা।

(সকলের প্রণাম ও ঠাকুমার প্রস্থান')।

ম। ঠাকুমা আমাদের দেখ্‌চি ডাক্তার কবিরাজের উপর।

লী। যে উপকার ঠাকুমার দ্বারা পেয়েছি তা আর কি বলবো। ঠাকুমা না থাকলে বোধ হয় - ছেলেপিলেগুলকে বাঁচাতে পারতাম না। কত লোকের কত কঠিন ব্যেরাম যে ঠাকমা সামান্য ওষুদে ভাল করেছেন, তার আর সংখ্যা নেই; এখন যেকয়দিন বাঁচেন—আমাদেরই লাভ।

ম। তুমিও ত ক্রমশঃ ঠাকুমা হয়ে উঠছ বৌদি।

লী। অনেক শিখেছি বটে, কিন্তু অমন পাকা হ'তে পারি না।

ম। দিদি কি এখন এখানে থাকবে?

লী। না আমায় এখনি যেতে হবে।

ম। আমিও যাব। কিন্তু বাড়ীর কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। একবার সকলের সঙ্গে দেখা করে আসি।

লী। চল, আমরা যাই।

(সকলের প্রস্থান)।

শিশুর উদরাময় চিকিৎসা।

(মাঘ সংখ্যার ২০০ পৃষ্ঠার পর)

লী। আর ছানার জল?

ঠা। এই আমাশা রক্তামাশা, অতিসার যখন বাড়াবাড়ি হয়, তখন ছানার জল খুব ভাল পথ্যি। দুধ কি ঘোল না সইলে কি বেশী না সইলেও একটু একটু ছানার জল দেওয়া ভাল।

লী। সে কি করে করব?

ঠা। দুধ গরম করে তাইতে পাতি কি কাগজি লেবুর রস দিবি। তা হইলেই—ছানা কেটে যাবে। তারপর সেইটে ছেঁকে যে নীল জল বেরুবে, সেইটে খাওয়াবি। কিন্তু ছাঁকবার সময় যেন ছানাটা টিপিস না। তা হ'লে ছানার কতক অংশ (পাতলা শাদা শাদা রঙ্গের) ছানার জলের সঙ্গে মিশিয়ে যাবে। যখন ঐ সব রোগ খুব প্রবল তা কি বড় লোকের কি ছোটছেলের, তখন এই ছানার জল, খুব পাতলা ভাতের মাড় কি বার্লিতে লেবুর রস আর মিছরী দিয়ে কাপড়ে ছেঁকে পথ্যি দিলে আর বড় ওষুদ দেবার দরকার হয় না। একটু বেদানার রস আর চীনে কেসুরও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেসুর চিবিয়ে ছিব্‌ড়ে ফেলে দিতে হয়। তবে আগেই বলেছি যে—ছোট ছেলেদের একেবারে দুধ বন্ধ করতে নেই।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, বড় খোকাকে পোরের ভাত কি একবেলা না দুবেলা দেব?

ঠা। যেমন খিদে আর যেমন সয় দেখে একবেলা কি দুবেলা দেওয়া যেতে পারে, তবে খুব পেট ভরে খেতে দিস্‌নে, একটু খালি রেখে দিস্।

লী। আর ছোট খোকাকে কি দেব?

ঠা। দুধ দেওয়ার কথাত বলিছি। তা ছাড়া বড় খোকার যে পোরের ভাত হবে তাই খুব চট্‌কে চট্‌কে একটু কাঁচকলা চটকানর

সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবি। যদি তা না খায়, তাহ'লে মাড় করে দুধের সঙ্গে খাওয়াবি। আর আগে যে বার্লি বা শটীর পালোর কথা বলিছি, তাও দিতে পারিস্। মিহি পুরাণ চাল গুঁড়িয়ে খুব মিহি করে ছেঁকে বার্লির মত সিদ্ধ করে দিলেও চলে।

নী। আর কি দেব?

ঠা। আবার কি দিবি? ভোলাবার জন্যে একটু বেদানার রস কি একটু মিষ্টি কমলা লেবুর রস দিতে পারিস। বেশী দিলে পেট কামড়ানি বাড়বে।

নী। দেখ ঠাকুমা, কেউ কেউ বলে যে আমাকেও পেটের অসুখের রোগীর মত পথ্যি করিতে হবে।

ঠা। ছেলে মাই খেলে তাই করিতে হয় বৈকি? খুব কচি ছেলের অসুখ হলে দেখেছি, কবিরাজে মাকে ওষুদ খাওয়ায় আর সেই ওষুদ মাইয়ের দুধে মিশে ছেলের উপকার করে। তা তুইত আর মাই দিস্‌না। আর তোর পেটেও একটা রয়েছে। তবে খোকা যখন এক আধ-বার টানে তখন একটু ধরা বাঁধায় থাকিস।

নী। আর কি নিয়মে থাকতে হবে বল?

ঠা। আর নিয়ম কিছু নয়। তবে দুধ যেন নষ্ট না হয়, দুধের বাটী, ঝিনুক যেন পরিষ্কার থাকে, সে দিকে খুব নজর রাখিস্। বাটী ঝিনুকের দোষে, আর খারাপ দুধ খেয়ে, অনেক সময় ছেলেপিলের অসুখ হয়; আর ছেলেদের খাওয়ান সম্বন্ধে খুব সুনিয়ম দরকার। অনেক পোয়াতী নিয়ম-মত না খাইয়ে, যখন সময় পায়, তখন খানিক দুধ জোরজবরদস্তী করে গিলিয়ে দেয়। বড় খোকাকে চার ঘণ্টা অন্তর আর ছোট খোকাকে তিন ঘণ্টা অন্তর খেতে দিবি। এটা হল সাধারণ নিয়ম। ভাত খাওয়ার চার ঘণ্টা পরে খেতে দিবি, কিন্তু যদি এক-বার অল্প একটু বার্লি দিস্, তবে তার তিন ঘণ্টা পরে কিছু দিস্। আর খাওয়াতে হলে প্রধান দেখা উচিত ছেলের খিদে। ছোট ছোট ছেলেরা খিদে থাকলেই খায়, আর খিদে না থাকলেই খেতে চায় না। খেতে না চাইলে জোর ক'রে খাওয়ান উচিত নয়। তা অনেক ছেলে আবার খিদে পেলেও খেতে চায় না, বুকে হাঁটু দিয়ে দুধ খাওয়াতে হয়। তাদের ঐ রকম নিয়মে খাওয়ান উচিত। আবার বড় ছেলে খিদে না থাকলেও খাবার দেখলে "খাব খাব" করে। তাদেরও ঐ রকম নিয়মে খাওয়াতে হয়। আর মলের দিকে লক্ষ্য রেখে, খাবার হজম হচ্চে কিনা দেখে, খাবার কমাতে বা বাড়াতে হয়।

নী। পথ্যিত হল। এখন ওষুদ কি বল?

ঠা। তিন চার দিন সুনিয়মে পথ্যি দিয়ে যদি অসুখ কমে যায়, তা হলে ওষুদ দেবার দরকার হবে না। নইলে এক কাজ করিস, বটগাছের যে ঝুরি নামে জানিস্‌ত?

নী। হাঁ, জানি।

ঠা। সেই ঝুরির আগা থেকে এক আনা (ছয় রতি) আন্দাজ নিয়ে চেলুনি জলের সঙ্গে বেটে ছোট খোকাকে আর দু আনা আন্দাজ বড় খোকাকে খাইয়ে দিবি। কচি বাবলা পাতা ও ওকড়ার কচি মূলও এই নিয়মে বেটে দিলে উপকার হয়।

নী। চেলুনী জল কি?

ঠা। গোটাকতক আতপ চাল খানিক ক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে, পাথরের ওপর চাল-

গুলো জলের সঙ্গে ঘষ্‌তে হয়। জলটা একটু শাদা শাদা হলেই চেলুনী জল হল।

লী। এতে যদি ভাল না হয়?

ঠা। এতেই ভাল হবে। যদি না হয়, তাহলে বেণের দোকান থেকে মুতো, পিপুল আতইচ আর কাকড়াশৃঙ্গী—এই চারটে জিনিষ কিনিয়ে আনবি। জিনিষগুলি পুরাণ, পোকা লাগা বা পচা না হয়। তারপর ঐ গুলি বেশ পরিষ্কার করে ঝেড়ে বেছে নিয়ে হামানদিস্তেয় গুঁড়ো করবি। তারপর কাপড়ে খুব মিহি করে ছেঁকে নিবি। তারপর চারটে জিনিষের মিহি গুঁড়ো সমান ভাগে একসঙ্গে মিসাবি। সেই গুড়োর ২রতি ছোট খোকাকে আর চার রতি বড় খোকাকে মধুতে মিশিয়ে খাওয়াবি।

লী। এত বড় হাঙ্গমা ঠাকমা?

ঠা। মনে করলেই তাই, নইলে কিছুই নয়। চারটে মসলা গুড়ো করা আর কি হাঙ্গামা?

লী। যদি হামানদিস্তে না থাকে?

ঠা। শীল পরিষ্কার করে ধুয়ে তাইতে গুঁড়িয়ে নিবি।

লী। আর একটা সহজ কিছু বল না?

ঠা। সহজ এর চেয়ে আর কি হবে? তবু একটা বলছি শোন।—এক তোলা বেল শুঁঠ আর এক তোলা আমগাছের ছাল থেঁতো করে আধসের জলে সিদ্ধ করে আদ পোয়া থাকতে নামাবি। মাটির হাঁড়িতে মন্দ মন্দ কাঠের আলে সিদ্ধ করতে হবে। তার পর ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হলে, তার এক তোলা কি দেড় তোলা বড় খোকাকে আর আধ তোলা কি পৌনে একতোলা ছোট খোকাকে খাওয়াবি। খাওয়াবার আগে ওর সঙ্গে ৮।১০ ফোটা মধু আর এক টিপ খৈয়ের গুঁড়ো মিশিয়ে নিস।

লী। রোজ সিদ্ধ করতে হবে?

ঠা। হাঁ, রোজ সিদ্ধ করতে হবে। আর বাকীটা ফেলে দিবি।

লী। ওষুধ কি একবার করে দেব?

ঠা। হাঁ, সকালে একবার করে দিবি। তবে রোগের বেশী বাড় থাকলে বিকেলেও সকালের মত নিয়মে দেওয়া যায়। আর পাচন হলে, সকালের পাচনটা না ফেলে দিয়ে তাই থেকে বিকেলে দেওয়া চলে।

লী। আচ্ছা, ঠাকুমা, এখন এই রকম করেই দেখি। তার পর না হয় আবার শ্রীচরণে হাজির হব।

ঠা। তার আর দরকার হবে না। ওতেই ভাল হয়ে যাবে।

লী। (পদধূলি লইয়া) সেই আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুমা।

ঠা। আশীর্ব্বাদত নিত্যই করি ভাই। রাজমাতা হও, রাজরাণী হও।

প্র। ঠাকুমা, তোমার শেষের আশীর্ব্বাদটা যে আমার পক্ষে বড় বিপজ্জনক। উনি যদি কোন রাজার রাণী হয়ে বসেন, তাহলে আমার উপায় কি হবে?

ঠা। কেন তুমিও রাজা হতে পার।

প্র। সেটা এজন্মে সম্ভব বলে মনে হয় না।

ঠা। পুরুষের ভাগ্যের কথা কে বলতে পারে?

লী। তুমি ঐ কর বসে, আমি চল্লাম।

(প্রস্থান)

প্র। বলি শোননা ওগো, আমায় ফেলে রেখেই চল্লে যে দেখছি? (প্রস্থান)

ঠা। এই দুটী প্রাণী কে জানে কোন অজ্ঞাত লোকে ছিল, তার পর সংসারে এল। এদের জন্মাতে দেখেছি, হামা দিতে দেখেছি, ছুটো ছুটী করে খেলা করতে দেখেছি। তার পর বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়ে পরস্পর অপরিচিত দুটী প্রাণী এত আপনার হয়ে গেছে যে—এক দণ্ড পরস্পরকে না দেখলে পৃথিবী শূন্য বোধ করে। অল্প দিন পূর্ব্বে যারা শিশু ছিল, তারা এখন শিশুর জনকজননী হয়েছে। একদিন আমিও সংসারে এ খেলা খেলেছিলাম, এ অভিনয় করেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার খেলা ফুরিয়ে এসেছে। কোন অজ্ঞাত লোক-থেকে যে আমার পাঠিয়ে ছিল, সে আবার ফিরে যাবার জন্য আহ্বান করছে। নারায়ণ! নারায়ণ! মুক্তকর জগদীশ!

(প্রস্থান)

বৈদ্যসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

(মাঘ সংখ্যার ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

মান্দ্রাজের "মেডিকেল কৌন্সিল," সভ্যগণের নাম তালিকা হইতে ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ারের নাম বাদ দিয়া আয়ুর্ব্বেদের ঘোরতর অবমাননা করিয়াছেন। এই অবমানায় "মেডিকেল কৌন্সিলেরই "অজ্ঞতা, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিতা ও নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। যে আয়ুর্ব্বেদ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে সতেজে দণ্ডায়মান থাকিয়া যুগযুগান্তর হইতে স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে, সেই আয়ুর্ব্বেদের বিমল যশোভাতি ইহাতে কিছুমাত্র ম্লান হইবে না। সপারিষদ শ্রীযুক্ত মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সভায় ডাঃ কৃষ্ণস্বামী ঘটিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ভারত-গভর্ণমেণ্ট কদাপি মান্দ্রাজ মেডিকেল কৌন্সিলের অভিমত সমর্থন করিবেন না এবং আয়ুর্ব্বেদের হিতার্থে যে ডাঃ কৃষ্ণস্বামী এতাদৃশ স্পষ্টবাদিতা সত্যপ্রিয়তা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন, তিনি আমাদের সদাশয় গবর্ণরের নিকট নিশ্চয়ই সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া জয় লাভ করিবেন। 'আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বলিতেছি যে—'মান্দ্রাজ মেডিকেল কৌন্সিলে'র এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক, এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ। 'বম্বে মেডিকেল কৌন্সিল' ডাক্তার পোপাত প্রভুরাম বৈদ্য, তাঁহার মৃত পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করার জন্য তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সমস্বরে তাহারও প্রতিবাদ করিতেছি।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতিবাদ যদ্যপি আমাদের উদারচেতা রাজরাজেশ্বর সম্রাটের উক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে উহা বিশেষ বলবান হইবে—সন্দেহ নাই, এই আশায় আমাদের মহামান্য সম্রাট ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতাগমনকালে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র প্রদত্ত অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন—তাহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

You are to conserve the ancient

learning and simultaneously to push forward Western science.,

অনুবাদ:—"প্রাচীন বিদ্যাকে রক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসার সাধন করা আপনাদের কর্ত্তব্য"। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-মতানুসারী ব্যক্তিগণ, ডাক্তার কৃষ্ণস্বামী এবং ডাক্তার পোপাত প্রভুরাম বৈদ্য মহোদয় দ্বয়কে অযোগ্য নির্দ্দেশ করিয়া কি সম্রাটের এই মহৎ বাক্যের অন্যথা করেন নাই? ভারত-সাম্রাজ্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালন করিতে হইলে পরস্পরের সহানুভূতি এবং একতা যে তাহার মূলসূত্র,—আমাদের সুবিবেচক সম্রাট তাহা স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞান যদি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া এক যোগে কার্য্য করে, তাহা হইলে সমধিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব। এক জন দুই এবং অপরে তিন জানিলে যদি উভয়ে মিলিত হয়, তবে উভয়েই পাঁচ জানিতে পারে। কিন্তু প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিলে একের সেই দুই এবং অপরের সেই তিনই রহিয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি আমরা পৃথক্ না থাকিয়া একত্র মিলিত হই, যদি পরস্পরের সহায়তায় উচ্চ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হই, যদি প্রতিবাসীদিগকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারি, যদি এ্যালো-প্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদবিদ্ এবং ইউনানীচিকিৎসক,—সকলে মিলিত হইয়া এক মহান্ উদ্দেশ্যসাধনে যত্নবান হইতে পারি, তাহা হইলে মানবজাতির রোগ যন্ত্রণা এবং অকাল মৃত্যু বহুল পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে —সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদপেক্ষা উচ্চতর এবং মহত্তর উদ্দেশ্য জগতে আর কিছুই নাই, এবং পরস্পরের সহানুভূতি সেই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়। আমাদের সদাশয় সম্রাট সেই সহানুভূতিরই সূচনা করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের উদারচেতা রাজ-প্রতিনিধির হৃদয়ও সহানুভূতিপূর্ণ। সমবেত সভ্যমহোদয়গণ, আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া আমাদের রাজপ্রতিনিধির নিকট এই উভয় প্রকার চিকিৎসা-বিদ্যাকে পৃথক্ করিবার নীচ এবং স্বার্থপর চেষ্টার বিরুদ্ধে আবেদন করি।

যে সকল চিকিৎসক দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করেন, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তাঁহাদিগকে মিউনীসিপালিটীর চিকিৎসালয়ে এবং অন্যান্য সাধারণ চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা-কার্য্য করি-বার অধিকার দিয়া যে উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য 'বম্বে গবর্ণমেণ্ট' আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অবশেষে, 'বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটী' আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে প্রাচীন বিদ্যা-শিক্ষা-বিভা-গের অন্তর্গত করিয়াছেন বলিয়া আমরা আহ্লাদের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি—তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা এবং আয়ুর্ব্বেদের আটটী লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উন্নতি-মূলক গবেষণার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে উৎসাহ প্রদান করিবেন। ডাক্তার পি সি রায় হিন্দু রসশাস্ত্রসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী হিন্দু শস্ত্র-চিকিৎসাসম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধের জন্য, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত হিন্দুদিগের শস্ত্রসম্বন্ধীয় পুস্তকের জন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ একটী সুমহান্ গবেষণা মন্দির। প্রাচীন ঋষি-দিগের যে সকল অদ্ভুত আবিষ্কার বহু শতাব্দী ব্যাপী অবহেলার ফলে বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন

হইয়া গিয়াছে, সে গুলির যখন পুনরুদ্ধার হইবে, তখন তদ্দ্বারা রোগপীড়িত মানব-জাতির পরম মঙ্গল সাধিত হইবে—সন্দেহ নাই। অপিচ সেই সকলের সাহায্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিবে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও আপনাদের অজ্ঞাত বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সভ্য মহোদয়গণ, উপবেশন করিবার পূর্ব্বে আপনারা আমার বক্তব্য বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সর্ব্ব-শক্তিমান্ বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে—মহদুদ্দেশ্যসাধনে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা সুসিদ্ধ হউক।

"সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু"।

(সম্পূর্ণ)

আয়ুস্তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিপরীত হইলে অদীর্ঘ, অসুখকর ও অনিয়ত হয়। যদি দৈব ও পুরুষকার মধ্যম হয় নিয়তি ও সুখ মধ্যম হইয়া থাকে। দৈব ও পুরুষকার হীনবল হইলে আয়ুও হীন হইয়া থাকে। প্রবল পুরুষকার দুর্ব্বল দৈব কর্ম্মকে পরাভূত করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে প্রবলদৈবও দুর্ব্বল পুরুষকারকে বাধা দেয়। সাধারণতঃ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, একজন প্রতিভাসম্পন্ন, উন্নতমনাঃ, উদযোগী ব্যক্তি বহুচেষ্টায়ও একটি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না, অপর ব্যক্তি তাদৃশী শক্তি লাভ না করিয়াও অনায়াসে কার্য্য উদ্ধার করিতেছে, এ স্থলে বলিতে হইবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পুরুষকার সম্পন্ন হইয়াও প্রতিকূল দৈববশাৎ বা দুর্ব্বল দৈববশতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রবল দৈববলে অনায়াসে সে কার্য্য উদ্ধার করিতেছে। জগতের যাবতীয় কার্য্যই দৈব পুরুষকার ও কাল সাপেক্ষ, এই তিনটীর একত্র সমাবেশ না হইলে কোন কার্য্যই হয় না। যেমন কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজ বপন ইত্যাদি পুরুষকার সাপেক্ষ কর্ম্ম করিয়াছে, তখন দৈব বর্ষণ না করিলে বা বৃষ্টি না হইলে কেবল বীজবপনে তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইবে না, আবার বর্ষণ হইলেও নির্দ্দিষ্ট সময় না হইলে শস্য অঙ্কুরিত হইবে না, হইলেও সীমাবদ্ধ কাল না পাইলে উহা ফলপ্রসূ হইবে না। তদ্রূপ পরমায়ুব্যাপার ও জাগতিক সমস্ত কার্য্যই, দৈব, পুরুষকার এবং কালের অধীন। এরূপ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে পরমায়ুর পরিমাণ বিধাতা কর্ত্তৃক ব্যক্তিভেদ ও অবস্থাভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে।

বস্তুতঃ আয়ুর কাল বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট নহে, কোন মহাফল কর্ম্মই দীর্ঘায়ুরূপে পরিণত হয়। এস্থলে মহাফলকর্ম্ম শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে,—কোন ব্যক্তি নানা প্রকার কুপথ্যাদি সেবন করিয়াও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেছে দেখা যায়, কিন্তু সে অলক্ষিতভাবে এরূপ কোন মহাফলজনক কার্য্য করিতেছে যাহা তাহার দীর্ঘজীবিতার কারণ স্বরূপ হইতেছে

হয়তো সে তাহা নিজেও লক্ষ্য করে নাই, কিম্বা অপরেও তাহা লক্ষ্য করে নাই। আবার কোন ব্যক্তি হয়তো সহস্র সুপথ্যসেবী হইয়াও অকালে সংসার হইতে বিদায় লইতেছে,—এরূপস্থলে বুঝিতে হইবে কোন অলক্ষিত মহাপ্রভাব কর্ম্মই এরূপ অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। আবার কোন মহাফল কর্ম্মই অনিয়তায়ুর হেতু হইতেছে, যখন উভয় প্রকারই দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে তখন আয়ুর নিয়তত্ব স্বীকার করা যুক্তি-সঙ্গত নহে।

আমাদের পরমায়ু যে অনিয়ত তাহাই মহর্ষিদৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন।

"যদি হি নিয়তকালপ্রমাণমায়ুঃসর্ব্বং স্যাদায়ুস্কামানাং ন মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপ-হারহোমনিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপবাস-স্বস্ত্যয়নপ্রণি-পাতগমনাদ্যাঃ ক্রিয়া ইষ্টয়শ্চ প্রযোজ্যেরণ্ নোদ্ভ্রান্তচণ্ডচপলগোগজোষ্ট্রখর তুরগমহিষাদয়ঃ * * * নসাহসং ন দেশকালচর্য্যা ন নরেন্দ্র-প্রকোপ ইত্যেবমাদয়ো ভাবা নাভাবকরাঃ স্যুরায়ুষঃ সর্ব্বস্য নিয়তকালপ্রমাণত্বাৎ "নচাভ্যস্তাকালমরণভয়নিবারকানা মকাল-ভয়মাগচ্ছেৎ প্রাণিনাং ব্যর্থাশ্চারম্ভকথা-প্রয়োগবুদ্ধয়ঃ স্যুর্ম্মহর্ষীণাং রসায়নাধিকারে। নাপীন্দ্রো নিয়তায়ুষং শত্রুং বজ্রেনাভিহন্যাৎ, নাশ্বিনা বার্ত্তং ভেষজেনোপপাদয়েতাং নর্ষয়ো যথেষ্টমায়ুস্তপসা প্রাপ্নুয়ুর্নচ বিদিতবেদিতব্যা মহর্ষয়ঃ সসুরেশাঃ সম্যক্ পশ্যেয়ুরুপদিশেয়ু রাচরেয়ুর্ব্বা।

যদি আয়ুর পরিমাণ বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইত, তবে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া কেন মন্ত্র, ঔষধি, মণি, হোম, প্রায়-শ্চিত্ত, স্বস্ত্যয়ন, বিনীতাচরণ প্রভৃতি স্বীকার করা হয়? যদি আয়ু নিয়তই হইত, তবে উদ্‌-ভ্রান্ত, প্রচণ্ড, চঞ্চল, গো, মহিষ, উষ্ট্র প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা ও প্রবল বায়ু ও ঘূর্ণীবায়ু হইতে নিজকে সাবধান করিবার আবশ্যক হইত না, অপিচ নগপ্রপাত, গিরিসংকট, দুর্গমস্থান, প্রবল জলস্রোতঃ, প্রমত্ত, নৃশংস, ঈর্ষ্যা ও লোভপরতন্ত্র শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা বা তাহা-দিগকে পরাভূত করিবার বাসনা কিম্বা প্রবলাগ্নি বিবিধ বিষধর সর্প ও সরীসৃপ প্রভৃতি হইতে দূরে পলায়নের চেষ্টার আবশ্যক থাকিত না। যদি আয়ুর পরিমাণ নির্দ্দিষ্টই থাকিত, তবে দুঃসাহস, দেশ ও কালের বিরুদ্ধাচরণ রাজরোষ ইত্যাদি ও আয়ুনাশ করিতে সমর্থ হইত না। যদি অকাল মরণের নিয়ম না থাকিত, তবে অকালমরণ ভীতি প্রাণিদিগের হৃদয়ে সমুদিত হইত না। রসায়ন-প্রয়োগে দীর্ঘ জীবন লাভ ও জরাব্যাধি বিদূরিত হয় ইত্যাদি ঋষিবাক্য বৃথা বাক্যাড়ম্বর বলিয়া বোধ হইত, আর যদি শত্রুর আয়ু নিয়তই হইত, তবে শত্রু তাহাকে অস্ত্র প্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা করিত না, এবং চিকিৎসকগণ বিবিধ প্রকার ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন না, কিংবা ঋষিগণ কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা প্রচুর আয়ুর অধিকারী হইতেন না। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণ সুস্থদেহে দীর্ঘজীবন লাভের উপদেশ দান ও তদনুরূপ বিবিধ আচরণ করিতেন না।

"তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতং। অতো-বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ, অপিচ দেশকালাত্মগুণ-বিপরীতানাং কর্ম্মণাং আহারবিকারাণাঞ্চ ক্রিয়োপযোগঃ সম্যক্ সর্ব্বাতিযোগসন্ধারণ মসন্ধারণমুদীর্ণানাঞ্চ গতিমতাং সাহসানাং

বর্জ্জনং আরোগ্যানুবৃত্তৌ উপালভামহে হেতু-মুপদিশামঃ সম্যক্ পশ্যামশ্চেতি।

অতএব স্থির হইতেছে দীর্ঘজীবন লাভের মূল উপায় হিতজনক আহার আচার সেবা। এতদ্বিপরীত মৃত্যুর কারণ, পরন্তু দেশকাল ও স্বভাবের বিপরীতাচরণ বা আহার বিহারাদির বিপরীতাচরণও অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমরা সর্ব্বদা বুঝিতেছি বলিতেছি ও দেখিতেছি যে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার পরিহার, মলমূত্রাদির বেগধারণ না করা এবং গতিশীল জন্তু ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম সমূহের পরিহার আরোগ্যের কারণ। যদি পরমায়ুর পরিমাণ এরূপ অনিশ্চিতই রহিল, তবে কাল ও অকাল মৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়? তাহাও সরল দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

"যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈরুপেতঃ সর্ব্বগুণোপপন্নোবাহ্যমানো যথাকালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবসানং গচ্ছেৎ তথায়ুঃ শরীরোপগতং বলবতঃ প্রকৃত্যা যথাবদুপচর্য্যমাণং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেবাবশানং গচ্ছতি, স মৃত্যুঃ কালে তথা স এবাক্ষো অতিভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ বিষমপথাদপথাদক্ষচক্রভঙ্গাদ্বাহ্যবাহক-দোষাদনির্ম্মোক্ষাৎ পর্য্যসনাদনুপাঙ্গাচ্চান্তরা ব্যসনমাপদ্যতে, তথায়ুরপি অযথাবলমারম্ভাদযথাগ্ন্যভ্যবহরণাদ্বিষমশরীরন্যাসাৎ অতিমৈথুনাদসৎসংশ্রয়াৎ উদীর্ণবেগবিনিগ্রহাৎ বিধার্য্যবেগাবিধারণাৎ ভূতবিষাগ্ন্যুপতাপাৎ অভিঘাতাৎ আহারবিবর্জ্জনাৎ চাণ্ডরাব্যসনমাপদ্যতে স মৃত্যুরকালে, তথাজ্বরাদীনপ্যাতঙ্কান্মিথ্যোপচরিতানকালমৃত্যূন্পশ্যাম ইতি।

যেমনশকটের চক্রমণ্ডল প্রকৃত চক্রগুণ সম্পন্ন ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও ব্যাহ্যমাণ হইতেই যথাকালে নিজ প্রমাণের ক্ষয় বশতঃ অবসান বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ শরীরের আয়ু ও বলবানের প্রকৃতি গুণে যথাবৎ উপচর্য্যমাণ হইয়াও নিজপ্রমাণের স্বাভাবিক ক্ষয় বশতঃ যথাকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহাকেই আমরা কালমৃত্যু বলিয়া থাকি, আবার সেই চক্রমণ্ডল বা গাড়ীর চাকা অতিভার বশতঃ বিষমপথ বা উচ্চনীচপথ অথবা অপথ বশতঃ চক্রভঙ্গবশতঃ বাহ্যবাহকদোষ বশতঃ বা পরিচালক ও আরোহীর পরিচালন আরোহণ দোষে, অথবা চক্রগুলির অনির্ম্মোক্ষণ বা খুলিয়া পরিস্কার না করার জন্য বিপর্য্যস্ত হয়, বা অসময়ে ক্ষয় অর্থাৎ বিপন্ন হয়, তদ্রূপ দেহীরও অযথারূপে দেহের পরিচালন এবং অনিয়মে আহার বিহারাদি দ্বারা অসময়ে দেহের পতন ঘটিয়া থাকে তাহাকেই আমরা দেহের অকালমৃত্যু বলিয়া থাকি।

পূর্ব্বে আমরা আয়ুর্ব্বেদের লক্ষণে বলিয়াছি হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ, দুঃখায়ুঃ, আয়ুর হিত অহিত, পরমায়ুর পরিমাণ, যাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ, এপর্য্যন্ত আমরা, পরমায়ু কি ও তাহা নিয়মিত কি অনিয়মিত তাহার বিচার করিলাম, এক্ষণে হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ, দুঃখায়ু কি, তাহার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ কি, তাহাই আমাদের বক্তব্য। জীবমাত্রেই স্বকীয় প্রাক্তন সুকৃতি বা দুষ্কৃতিবশে ইহজীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ দারিদ্র্যের অধিকারী হইয়া থাকে, কর্ম্মফল ভোগ দেহী মাত্রেরই অনিবার্য্য সুতরাং যাহার যেরূপ কর্ম্ম তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতেই হইবে। শুভ কর্ম্মের ফলে হিতায়ু ও সুখায়ুর ভোক্তা ও অশুভ কর্ম্মফলে অহিতায়ু ও দুঃখায়ুর ভোক্তা জীবকে হইতে হইবে।

নিম্ন লক্ষণবিশিষ্ট জীবিতকালকে সুখায়ুঃ বলে।

"তত্র শরীরমানসাভ্যাং রোগাভ্যামনভিদ্রুতস্য বিশেষেণ যৌবনবতঃ সমর্থানুগতবলবীর্য্য পৌরুষপরাক্রমস্য জ্ঞান বিজ্ঞানেন্দ্রিয়ার্থবলসমুদায়স্য পরমর্দ্ধিরুচিরবিবিধোপভোগস্য সমৃদ্ধসর্ব্বারম্ভস্য যথেষ্টবিচারিণঃ সুখমায়ুরুচ্যতে অসুখমতো বিপর্য্যয়েণ।

যে ব্যক্তিশারীর ও মানসরোগে অভিভূত নহে, যে ব্যক্তি বিশেষরূপে স্থির যৌবনের অধিকারী হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বলবীর্য্য পৌরুষ পরাক্রম সম্পন্ন, যাহার জ্ঞান (শাস্ত্র জ্ঞান) বিজ্ঞান (তদর্থনিশ্চয়শাস্ত্রানুযায়িনী নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিঃ) ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ ও বল সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে, যে ব্যক্তি পরম শ্রীসম্পন্ন রুচিকর বিবিধ উপভোগসমর্থ এবং যাহার সমস্ত চেষ্টাই সুসম্পন্না এবং যে ব্যক্তি স্বাধীন তাহার আয়ুকে সুখায়ু বলে। ইহার বিপরীত হইলে অসুখায়ু বলিয়া থাকে।

নিম্নোক্ত লক্ষণটি হিতায়ু বলিয়া কথিত।

হিতৈষিণঃ পুনর্ভূতানাং পরস্বাদুপরতস্য সত্যবাদিনঃ শমপরস্য পরীক্ষ্যকারিণোঽপ্রমত্তস্য ত্রিবর্গং পরস্পরেণানুপহতমুপসেবমানস্য পূজার্হসম্পূজকস্য জ্ঞানবিজ্ঞানোপশমশীলস্য বৃদ্ধোপসেবিনঃ সুনিয়তরাগের্ষ্যামদমানবেগস্য সততং বিবিধপ্রদানপরস্য তপোজ্ঞানপ্রশমনিত্যস্যাধ্যাত্মবিদস্তৎপরস্য লোকমিমঞ্চামুঞ্চাপেক্ষমানস্য স্মৃতিমতোহিতমায়ুরুচ্যতে অহিতমতোবিপর্য্যয়েণ।

যিনি প্রাণিগণের হিতাকাঙ্ক্ষী পরধনে বীতস্পৃহ, সত্যবাদী, শান্তিপ্রিয় সমীক্ষ্যকারী (পূর্ব্বাপরদৃষ্টি রাখিয়া কাজকরা) অপ্রমত্ত (সুখদুঃখে সমভাব) ধর্ম্মার্থকামের পরস্পর অবিরোধে ভোগকারী, পূজ্যজনের পূজক, জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন, বৃদ্ধের সম্মানকারী রাগ বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা মদ ও মানের বেগধারণকারী, সতত বিবিধ দানপরায়ণ, তপোজ্ঞান শান্তিপরায়ণ অধ্যাত্মবিদ ও তৎপর (অধ্যাত্মপর) ইহা ও পরলোকের হিতাভিলাষী এবং স্মৃতিমান্ ঈদৃশজীবিতকালের নাম হিতায়ুঃ ইহার বিপরীত অহিতায়ুঃ।

ক্রমশঃ।

কবিরাজ শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন।

রোগ।

জীবশরীর—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, লসীকা, বসা, ওজঃ, ত্বক্, শকৃৎ, মূত্র, স্বেদ, বায়ু, পিত্ত, কফ, হৃদয়, যকৃৎ, ফুস্ ফুস্, ক্লোম, বৃক, স্নায়ু, ধমনী, সিরা, রসায়নী প্রভৃতি স্থূলও সূক্ষ্ম ভেদে নানাবিধ শরীরোপকারক দ্রব্যদ্বারা গঠিত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যের গুণ যথা—গৌরব, লাঘব, শৈত্য, ঔষ্ণ্য, রূক্ষতা, কার্কশ্য, বৈশদ্য, পৈচ্ছিল্য, সান্দ্র, দ্রব, কাঠিন্য, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি; এবং এই সকল দ্রব্যের কর্ম্ম যথা—উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন, আকুঞ্চন, প্রসারণ, নিমেষ, উন্মেষাদি দ্বারা শরীর ধৃত, বর্দ্ধিত ও যাপিত হয়। যদি কোন কারণে এই সকল দ্রব্য, দ্রব্যের গুণ বা কর্ম্ম অথবা বৃদ্ধ, ক্ষীণ বা বিকৃত হয়, তাহা হইলে শরীর পীড়িত হইয়াছে বলা যায়। মহর্ষি চরকও ব্যাধির এই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যেষামেব হি ভাবানাং সম্পৎ সঞ্জনয়েন্নরম্।
তেষামেব বিপদ্ব্যাধীন্ বিবিধান্ সমুদীরয়েৎ॥

অর্থাৎ যে সকল ভাবের সম্পৎ হইতে মনুষ্যদেহ গঠিত হইয়াছে, তাহাদেরই বিপদ হইতে বিবিধ রোগের উদ্ভব হয়।

নিজ ও আগন্তুভেদে রোগ দুই প্রকার। দোষপ্রকোপজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নিজরোগ। ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি, সম্প্রহারাদিসমুত্থ রোগকে আগন্তু রোগ কহে। শরীর-দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, ও কফের প্রকোপজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শারীর রোগ এবং মানস দোষের অর্থাৎ রজঃ এবং তমঃর প্রকোপ জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মানসরোগ। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে রোগের আশ্রয় শরীর এবং মন। কিন্তু একের পীড়ায় অপর অবশ্যই পীড়িত হয়। আধার ভূত শরীর পীড়িত হইলে আধেয় মন পীড়িত হয়, আবার আধেয় মন পীড়িত হইলে আধারভূত শরীর পীড়িত হয়। যেমন উত্তপ্ত কটাহে কোন দ্রব্য রাখিলে সেই দ্রব্য কিংবা উত্তপ্ত দ্রব্য কোন কটাহে রাখিলে সেই কটাহ উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ শরীর ও মনের বিষয় বুঝিতে হইবে, আত্মায় কোন প্রকার রোগ আশ্রয় করে না, কারণ আত্মা নির্ব্বিকার। তবে ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত আত্মাই পীড়া অনুভব করেন।

আগন্তু রোগের পূর্ব্বে যদিও দোষ প্রকোপ হয় না, তথাপি রোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই দ্রব্যে রসোৎপত্তির ন্যায় দোষ-সংক্রমণ অনিবার্য্য।

রোগসকল নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত হইতে পারে (১) পিতার শুক্র কিংবা মাতার আর্ত্তব দুষ্টিজন্য ভ্রূণশরীরে কুষ্ঠার্শমেহাদি যে রোগ সংক্রমিত হয়, তাহার নাম সহজ রোগ। (২) গর্ভকালে জননীর অপচার-হেতু কিংবা দোহদের (গর্ভকালে যে জিনিষে গর্ভিণীর লোভ হয়, তাহার নাম দোহদ) অভাব-হেতু ভ্রূণের কুষ্ঠ, পৈঙ্গল্য কিলাসাদি যে রোগ হয়, তাহার নাম গর্ভজ রোগ। (৩) অত্যধিক অপতর্পণ বা সন্তর্পণরূপ মিথ্যাহারবিহারাদি-জন্য উৎপন্ন রোগকে স্বাপচারজ রোগ কহে। (৪) ক্ষত, ভঙ্গ, প্রহারাদি এবং ক্রোধ শোক ভয় প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন যে শরীর ও মানস রোগ, তাহার নাম পীড়াকৃত বা আগন্তু ব্যাধি। (৫) শীতোষ্ণবর্ষ লক্ষণ কাল ত্রয়ের বিকৃতি-জন্য কিংবা যে কালে যে বিধি পালনীয়, তাহার অননুষ্ঠানজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কালজ রোগ। (৬) দেবগুরুর অপমাননা; অথর্ব্ববেদবিহিত শ্যেণযাগাদি অথবা ভূতাভিষঙ্গপ্রভৃতি কারণজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রভাবজ রোগ। (৭) কালেই হউক কিংবা অকালেই হউক, ক্ষুধা, পিপাসা এবং জরাদি যে সকল রোগ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম স্বাভাবিক রোগ। সর্ব্বপ্রকার রোগই এই সাত প্রকারের কোন না কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত। রুক্ সামান্য হেতু অর্থাৎ পীড়া দেওয়া সকল প্রকার রোগের সাধর্ম্ম্য বলিয়া সকলকেই রোগ নামে অভিহিত করা হয়। নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, সম্প্রাপ্তি এবং চিকিৎসার ভেদে রোগের অসংখ্য ভেদ কল্পিত হয়। সর্ব্বপ্রকার রোগে দোষ প্রকোপ থাকিতে হইবে। প্রথমতঃ নিদান-সেবনজন্য দোষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; পরে সেই বৃদ্ধ দোষ প্রকুপিত হইয়া উঠে; প্রকোপের পর প্রসর হয় অর্থাৎ স্বস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে আরম্ভ করে, পরে একটী স্থান সংশ্রয় করিলে রোগের প্রকাশ হয়।

দোষের বৃদ্ধি-হেতু যেমন পীড়া জন্মে, সেইরূপ দোষের ক্ষয়-হেতুও পীড়া জন্মে। যেমন শ্লেষ্মার ক্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকৃতিস্থ পিত্তকে স্থানান্তরিত করিয়া যেখানে যেখানে বিচরণ করে,গাত্রের সেই সেই স্থানে ভেদনবৎ পীড়া, দাহ শ্রম ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, সেইরূপ পিত্তের ক্ষয় উপস্থিত হইলে বায়ু শ্লেষ্মাকে স্থানান্তরিত করিয়া শরীরের বেদনা, শৈত্য, স্তম্ভ ও গুরুতা উৎপাদন করে। এইরূপে দেহের ক্ষয়-হেতু নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হইতে পারে। রোগ সকলের মধ্যে কতকগুলি রোগ সামান্যজ অর্থাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপজন্য উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন জ্বর একটি সামান্যজ রোগ; ইহা বায়ু, পিত্ত কিংবা কফ যে কোন দোষের প্রকোপহইতে উৎপন্ন হয়। সেইরূপ রক্তপিত্ত, অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগও সামান্যজ। আর কতকগুলি রোগ আছে, তাহারা নিয়ত একদোষের প্রকোপজন্য উৎপন্ন হয়। যথা গৃধ্রসী, খঞ্জত্ব, কুব্জত্ব প্রভৃতি অশীতি প্রকার বাতবিকার। দাহ, দবথু, ধূমক, অম্লক প্রভৃতি চত্বারিংশৎ পিত্তবিকার। তৃপ্তি, স্তৈমিত্য, আলস্যপ্রভৃতি বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মবিকার। গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতবিকার নিয়ত বায়ুপ্রকোপ ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, পৈত্তিক কিংবা শ্লৈষ্মিক গৃধ্রসী রোগ কখনই উৎপন্ন হয় না। সেই প্রকার দাহপ্রভৃতি পৈত্তিক রোগ কখন পিত্তভিন্ন বায়ু কিংবা শ্লেষ্মজন্য উৎপন্ন হয় না, এবং তৃপ্তিপ্রভৃতি শ্লৈষ্মিক রোগ, বায়ু বা পিত্তজন্য কখনও উৎপন্ন হয় না। এই সকল রোগকে নানাত্মজ ব্যাধি বলা হয়।

রোগসকল কোথাও একদোষপ্রকোপজন্য, কোথাও বা যুগপৎ দ্বিদোষ প্রকোপজন্য এবং কোথাও বা যুগপৎ ত্রিদোষ প্রকোপজন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ প্রকোপজন্য যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা দুই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকারের নাম প্রকৃতি সম সমবায় এবং অপর প্রকারের নাম বিকৃতিবিষম সমবায়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, যদি বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক কিংবা সান্নিপাতিক রোগে সেই সেই লক্ষণেরই প্রকাশ থাকে, তবে তাহা প্রকৃতিসম-সমবায়, আর যদি সেই সেই লক্ষণভিন্ন অন্য লক্ষণ ও প্রকাশ পায়, যেমন—ঘর্ম্মাগম বায়ুর ধর্ম্ম নহে, শ্লেষ্মার ধর্ম্মও নহে, অথচ বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে ঘর্ম্মাগম একটী লক্ষণ, ইহা বিকৃতিবিষম-সমবায়। সাধারণতঃ দোষ ও দূষ্যের সংযোগে রোগ উৎপন্ন হয়। যেখানে সংযোগে উভয়ের বিক্রিয়া উৎপন্ন না হয়, সেই খানে প্রকৃতিসম-সমবায় দেখায়। কিন্তু যেখানে সংযোগে উভয়ের বিক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই খানে বিকৃতিবিষম-সমবায়। দ্বন্দ্বজ এবং সান্নিপাতিক রোগস্থলে সর্ব্বত্র যে এক প্রকার লক্ষণ দেখা যাইবে, এমন হইতে পারে না। কারণ তারতম্যভেদে দোষের ৬৩ প্রকার ভেদ আছে। সেই ভেদজন্য রোগ-লক্ষণেরও ভেদ হয়। বাতশ্লৈষ্মিক রোগে যদি বায়ু ও শ্লেষ্মা তুল্যবলশালী হয়, তবে যে প্রকার লক্ষণ দেখা যাইবে, যেখানে বায়ু বা শ্লেষ্মা অধিক বলশালী কিংবা শ্লেষ্মা হীনবল হইবে, সেরূপ স্থলে আর সে প্রকার লক্ষণ দেখা যাইবে না। দোষের এই প্রকার যে ভেদ হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ সুশ্রুতের দোষ-ভেদীয়াধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

জ্বর।

আমি তখন দশমবর্ষীয় বালক, পিতা-মাতার স্নেহের উষায় আমার প্রভাত-জীবন তখন সুধাময়। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ উপভোগ হৃদয়ে তখনও অভাব অভিযোগ আনিতে পারে নাই। স্বনামধন্য পিতৃদেব তখন চুঁচুড়ায় একজন বড় কবিরাজ। নানা দিগ্-দেশাগত রোগিগণ জীর্ণ পাণ্ডুর দেহে তাঁহার আরোগ্যাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতির "মণিকর্ণিকায়", কত মণি-ময় মুকুট-মণ্ডিত মস্তক লুন্ঠিত হইত।

মুনিসহস্রের মধ্যবর্ত্তী আত্রেয় ঋষির মত, বহু শিষ্যের প্রীতি-পরিবেষ্টনের মধ্যে বসিয়া পিতা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পড়াইতেছিলেন, শুষ্ক মধ্যাহ্নে তাহার কণ্ঠস্বর সজল গম্ভীর মেঘ-গুনিতের ন্যায় শুনাইতেছিল। ডাক্তার কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম বি, মহাশয়ের তখন খুব প্রসার প্রতিপত্তি; উভয়ের নামের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া পিতৃদেবের সহিত কৈলাশ বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ট আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে, কৈলাশ বাবু প্রায়ই আমাদের বাটীতে বেড়াইতে আসিতেন, সে দিনও আসিয়াছিলেন। পিতা পড়াইতেছিলেন—

"জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ॥

কিছু না বুঝিতে পারিলেও, শৈশব-চপল-কৌতূহলের বশে—আমি সেখানে বসিয়া-ছিলাম। পিতার মুখে জ্বরের এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া সহসা কৈলাশ বাবু বলিয়া উঠিলেন——

"কবিরাজ মহাশয়! আজ আপনার কাছে একটা নূতন কথা শিখিলাম। জ্বরের মাথা আছে, হাত পা আছে, চক্ষুঃ কর্ণ আছে—ইহা ত এতদিন জানিতাম না। জ্বর কি জীব জন্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয়বান্? এই গুলাই আপ-নাদের শাস্ত্রের পাগলামী।"

বাল্যকালের স্মৃতিশক্তি যদি এই শেষ যৌবনে আমাকে প্রতারণা না করিয়া থাকে তাহা হইলে সাহস করিয়া বলিতে পারি—অস্তগমনোন্মুখ রবি-সদৃশ প্রশান্ত-মূর্ত্তি পিতা সে সময় কৈলাস বাবুর কথার কোনও উত্তর দেন নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন ব্যস্ত ভাবে কৈলাস বাবু আমাদের বাটীতে আসি-লেন—পিতাকে বলিলেন "সেদিন আপনার মুখে জ্বরের হাত পা আছে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, উপহাসও করিয়াছিলাম; কিন্তু আজ আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে। অনেক দুঃখেই ঋষিগণ জ্বরের মূর্ত্তি করিয়াছিলেন!" পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি কৈলাস বাবু? হঠাৎ এত ঋষি ভক্তি জন্মিল কিসে?" কৈলাস বাবু বলিতে লাগিলেন—

" * * * পুত্রের আজ ২৬।২৭ দিন জ্বর; কিছুতেই জ্বর বন্ধ হইতেছে না। অনেক চেষ্টার পর আজ ৩ দিন জ্বরের বিরাম হইয়াছে বটে, কিন্তু বিরাম-কাল অল্পক্ষণস্থায়ী। গৃহস্থের ব্যগ্রতাতিশয়-অনুরোধে, গত কল্য ডাক্তার সাহেবকে * আহ্বান করিয়া ছিলাম, প্রত্যহ বেলা ১১ টার সময় জ্বর আসিতেছিল, সে জ্বর সমস্ত দিন ভোগ হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ৬ টার সময় ছাড়িতে-ছিল। তাই আমরা উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলাম—আজ ঐ ৬ টার সময় হইতেই রোগীকে কুইনাইন প্রয়োগ করিব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—অন্যদিন জ্বর বেলা

১১ টার সময় আসিত, আজ একেবারে রাত্রি ৩ টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতেই আমার বিশ্বাস হইয়াছে—জ্বর নিশ্চয়ই জীব জন্তুর মত ইন্দ্রিয়বান্, তাহার কাণ আছে; রোগীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া আমরা দুইজন ডাক্তারে যে পরামর্শ করিয়াছিলাম, জ্বর সে কথা শুনিতে পাইয়াছে, এবং আজ সকাল সকাল আসিয়া, আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে !"

কৈলাস বাবুর রহস্য-চটুল ব্যঙ্গ শুনিয়া আমাদের বৈঠকখানা গৃহে, উৎস উচ্ছ্বাসের ন্যায় হাস্যকাকলি উত্থিত হইল। পিতাও হাসিলেন, কিন্তু সে হাসি নিদাঘ সন্ধ্যার চক্রবাল দীপ্তির মত চকিতে চমকাইয়া অধর প্রান্তেই মিশিয়া গেল। পিতা গম্ভীরভাবে বলিলেন —"কৈলাস বাবু! আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে হইলে মনে হিন্দুত্বের অভিমান থাকা চাই। মূলে যাহা 'অতীন্দ্রিয়'—তাহাকে নানা ইঙ্গিতে, নানা সঙ্কেতে, উপমায় রূপকে সাজাইয়া, ঋষিগণ—ইন্দ্রিয়ানুভূতির অধিকারে উপস্থিত করিয়া দিতেন আজ তুমি জ্বরের 'হাত পা'র কথা শুনিয়া উপহাস করিতেছ, কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যে দিন উপহাস উপাসনায় পরিণত হইবে।"

কিশোর অনুভূতির মধ্য দিয়া, পিতার সেই উদার উপদেশ, ভবিষ্যৎ জীবনে পূর্ণাবয়ব ধারণ করিয়া নিত্য সহচরের মত আমার সুখে দুঃখে, আনন্দে অবসাদে,—আজিও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। অতীত জীবনের কুহেলিকাচ্ছন্ন অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এই ঘটনাটি জাতিস্মরের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ন্যায় এখনও আমার প্রাণে জাগিয়া রহিয়াছে। সে আজ কত দিনের কথা—সত্যোদৃষ্ট সুখস্বপ্নের মত এখনও তাহা আমার স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল !

বাস্তবিক আমাদের তন্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সমস্তই রূপক রহস্যে পূর্ণ। আপনারা তান্ত্রিকের হরগৌরী মূর্ত্তি নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। শিবরূপী মহাকাল [মৃত্যু] বৃষভের উপর আরূঢ়, তাঁহার অঙ্কে বিশ্বজননী গৌরী। পুরাণে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের নাম "বৃষ"। হরগৌরী চিত্রের উপাখ্যান ভাগ—মরণের কোলে জীবন অধিষ্ঠিত। এ তত্ত্ব বৃষরূপী, অটল বিশ্বজনীন মহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। মরণের রাজ্যেই জীবণের নেপথ্য-বিধান, অর্থাৎ মরণের ভিতর দিয়াই জীবনের পথ; মাতৃঅংশ যখন আংশিক মরিয়া গিয়াছে, মাতার জীবনী-শক্তিতে শকিতে যখন শেষ ভাঁটা পড়িতেছে,—যখন তাহা মহাকালের কোলে অধিষ্ঠিত,—তখনই গর্ভের উৎপত্তি। এই গভীর দার্শনিক তত্ত্বকে, সরল সহজ ছবির মত আঁকিয়া, তান্ত্রিক দেয়ালে দেয়ালে, হৃদয়ে হৃদয়ে, টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। আপনারা এই রূপক রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করেন কি? আর্য্য ঋষির রূপক অসার গল্প নহে; তাহাতে প্রাকৃতিক সত্য, নৈতিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনার আভাষ থাকে। সূর্য্য উঠিলে কেতুরূপ অন্ধকার-সর্পের নাশ হয়, পুণ্য পাপকে বিধ্বস্ত করে, শ্রীকৃষ্ণ কোন একটী ভীষণ সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন—এই ত্রিতত্ত্বের সংযোগে 'কালীয়দমন' রূপকের সৃষ্টি। এ চিত্র অনেক দিন হইতেই ত আমাদের কক্ষপ্রাচীরে লম্বিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা চিত্রকরের উদ্দেশ্য বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি কি? আমরা ল্যাম্বারাস্ ময়ের চসমা চখে দিয়া হিন্দুর দিব্য দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাই

আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের নেত্রসমক্ষে বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, একদিন অভিন্ন হইয়া ধরা দিয়াছিল। *

আমাদের আয়ুর্ব্বেদেও এক সময়ে অনেক রূপক প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সেই সকল রূপকে যে শারীর তথ্য নিহিত আছে—আমরা পাঠকগণকে একে একে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। জ্বর সমস্ত রোগের রাজা, এইজন্য সর্ব্বপ্রথমে জ্বরের কথাই আলোচনা করিতেছি। তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি—বেদরহস্য প্রচার করিতে যেটুকু সাহিত্যশক্তির প্রয়োজন, আমি তাহাতে একেবারেই নিঃসম্বল।

জ্বর—এখন সর্ব্বজনবিদিত মহারোগ। বৈয়াকরণিক জ্বরের সংক্ষিপ্ত ধাতু নিরূপণ করিতে পারেন নাই। জ্বর সকল রোগের প্রধান, তান্ত্রিক পূজার সম্ভার সাজাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া জ্বরের পূজা করিয়াছেন। পুরাণকার জ্বরচরিত-অবলম্বনে লাবণ্যভূষণা দিব্য-ভাষায় জ্বরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবির রসময়ী লেখনী-মুখে জ্বরের যে বন্দনা-গুঞ্জন বাহির হইয়াছে—তাহা আরও অপূর্ব্ব! ঋষিগণ যে জ্বরকে রুদ্ররসের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই জ্বর বাঙ্গালী কবির হাতে পড়িয়া মধুযৌবনা প্রেমিকা সাজিয়াছে! কবি জ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

'নিত্য নিয়মিত ভাবে তুমি তো আসিবে যাবে
আফিসের যেমন কেরাণী।
কি করিবে কুইনাইন্, আর্শেনিক,পল্‌তা,নিম,
'ডিঃগুপ্ত' 'ভাইব্রোণা' ব্রাণ্ডী পাণি?
ইংরাজের মত তুমি, পাংচুয়েল, প্রেমময়ি!
ফরাসীর মত Positive.
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মত তুমি যে লো! স্বাভাবিক,
সময়ের মত সাময়িক!
তুমি যবে দাও দরশন—
পিরীতি-পরশরসে— ধৈরয বন্ধন খসে—
হাড়ে হাড়ে পেয়ে আলিঙ্গন!
কি কম্পন রন্ধ্রে রন্ধ্রে, দেখা দেয় প্রেমানন্দে
আপাদ মস্তক লোমে লোমে!
অস্থিচর্ম্ম সার দেহ রসের আবেশে গো!
বিছানায় টলে পড়ে ক্রমে!
কটি কটু কটায়িত, তনুরুচি সিহরিত,
ঠিক্ যেন, কুসুম কদম্ব!
ঘন ঘন শীৎকার— সুমধুর চীৎকার,
ক্ষণে দাহ, ক্ষণে গাত্র স্তম্ভ!'

জ্বরের মূক বিগ্রহকে নিশ্বাস ও ভাষা দিয়া, কবি যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন!

জ্বরের কথা বলিবার পূর্ব্বে—আমি সংক্ষেপে—এই মহারোগের ইতিকাহিনীর আলোচনা করিব।

পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ'। ঋগ্বেদে 'হৃদ্রোগ' 'হরিমাণ রোগ' 'ক্ষেত্রি রোগ' 'রাজযক্ষ্মা' প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু 'জ্বরের' নাম ঋগ্বেদে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এইজন্য দু'এক জন ঐতিহাসিক বলেন—বৈদিক যুগে এদেশে জ্বর রোগ দেখা দেয় নাই, বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ যুগ। তখন "আর্য্য-দস্যুর" বিরোধ বিগ্রহ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বসিয়া আর্য্যগণ

* রস্কিন তাঁহার 'কুইন অফ্ দি এয়ার' নামক গ্রন্থে রূপক সম্বন্ধে সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন।

বিলাসী হইয়াছেন। দেশে অজীর্ণ প্রভৃতি ব্যসন-জাত ব্যাধি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। "শল্য বৈদ্যের" চেয়ে 'ভিষগ্না অর্থর্ব্বণের' আদর বাড়িয়াছে। এ হেন আলস্য-মধুর ব্রাহ্মণ যুগে আমরা জ্বরের নাম খুঁজিয়া পাই না।

ব্রাহ্মণ যুগের শেষ ভাগ অথর্ব্ববেদের যুগ। তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরে যে অথর্ব্ব বেদ রচিত হইয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং 'অথর্ব্ব বেদকেও আমরা ব্রাহ্মণ যুগের ভিতরে ধরিব। ব্রাহ্মণ যুগে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় —'দকোদর' 'প্লীহোদর' 'পাণ্ডু' 'মেহ' 'যক্ষ্মা, 'অকাল বার্দ্ধক্য' প্রভৃতি রোগের কথা আমরা প্রথম জানিতে পারি। এ সকল রোগ বিলাসিতার সহচর। কিন্তু যে জ্বর রোগের রাজা বলিয়া চিকিৎসকগণ অভিনন্দন করিয়াছেন— ব্রাহ্মণ যুগে সে জ্বরের নামও পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অথর্ব্ববেদ অনেকগুলি 'ব্রাহ্মণের' পরে রচিত হইয়াছিল, ইহার সকল অংশও আবার এক সময়ে রচিত নহে। এই অথর্ব্ববেদে একটী নূতন রোগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম "তক্মণ"। এ রোগের লক্ষণ ঠিক জ্বররোগের মত. —তক্মণ যে কতকটা ম্যালেরিয়ার লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধি, পরে তাহা দেখাইব।

ব্রাহ্মণ যুগের পর 'আচার্য্য যুগ' – আর্য্য ভূমি তখন আর্য্য সভ্যতায় গৌরবান্বিত। ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াছেন, দেশের শান্তি রক্ষা করিতেছেন, বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্যে দেশের ধন ধান্য বৃদ্ধি করিতেছেন, কল্লোল-মুখরা দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর পূর্ব্বতীরে পর্ণকুটির রচিত হইয়াছে। স্থালী চুল্লী লইয়া ঋষিগণ সংসারী সাজিয়াছেন, মুনি-পত্নীগণ স্বামী-সেবায় ও সন্তান পালনে নারী জীবনের আদর্শ গঠন করিতেছেন। ঋষিবালকের মুক্তকণ্ঠের বেদ গাথায়, ঋষি কুমারীর হোমধেনু-দোহনকালীন কলহাস্যে কুশক্ষেত্র তখন মুখর হইয়া উঠিয়াছে ভারতে তখন ঋষিযুগ, ধর্ম্মের তখন উপনিষদ্ যুগ, আয়ুর্ব্বেদের আচার্য্য-যুগ।

আয়ুর্ব্বেদের তখন উদ্যমময় যৌবনকাল। আশ্রমে আশ্রমে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়,—মৌলিক অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আয়ুর্ব্বেদের তখন সকল বিভাগ সম্পূর্ণ। এই আচার্য্য যুগের প্রধান প্রতিনিধি এখন 'চরক' ও "সুশ্রুত" সংহিতা। চরকের চেয়ে সুশ্রুত আরও প্রাচীন গ্রন্থ। কেননা চরক সংহিতায় ইঙ্গিতে সুশ্রুতের উল্লেখ আছে—'ধান্বন্তর সম্প্রদায়ের' উপর কটাক্ষপাত আছে, কিন্তু সুশ্রুত সংহিতায় চরকের নাম গন্ধও নাই।

এমন যে প্রাচীনতম গ্রন্থ সুশ্রুত-সংহিতা' —তাহার নিদান স্থানে ও চিকিৎসা স্থানে জ্বরের কোন উল্লেখ নাই। জ্বরের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই, সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে সন্নিবিষ্ট। টীকাকার ডল্লন মিশ্রেরমতে—উত্তর তন্ত্র বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত। জ্বর ও জ্বর চিকিৎসা উত্তর তন্ত্রের প্রসঙ্গীভূত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস—সুশ্রুতের আমলে এদেশে জ্বর ছিল না। আমরা কিন্তু এ মতের পোষকতা করি না। আমাদের ধারণা—সুশ্রুত"শল্য বৈদ্যের সংহিতা" তাই সুশ্রুতের প্রথমাংশে কেবল শল্য শালাক্যের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর তন্ত্রে সুশ্রুত কায় চিকিৎসার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, হয়ত সেই জন্যই 'জ্বরতন্ত্র' উত্তর তন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

শল্য বৈদ্য ছিলেন বলিয়া, মহর্ষি যে কায় চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই, আমাদের ইহা বিশ্বাস হয় না। অমন পারগ সার্জ্জন যে নিজের গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রাখিবেন, এ কথা কি সাহস করিয়া বলা যায়? আমাদের অনুমান—সংহিতার অন্যান্য অংশের ন্যায় নাগার্জ্জুন এ অংশেরও প্রতি সংস্কার করিয়াছিলেন। অতএব জ্বর ও জ্বর চিকিৎসা উত্তর তন্ত্রের প্রসঙ্গীভূত বলিয়া, সুশ্রুতের সময়ে এ দেশে জ্বর ছিল না এ কথা বলা চলে না।

চরক সংহিতার নিদান স্থানের প্রথমেই কিন্তু জ্বর নিদান অধ্যায় এবং চিকিৎসা স্থানের 'রসায়ন" ও 'বাজীকরণ' শীর্ষক অধ্যায় দুইটির পরই জ্বরের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বৈদিক যুগে যে রোগ "রাজযক্ষ্মা" নামে পরিচিত ছিল, ব্রাহ্মণ যুগে তাহাই "তক্মণ" নামে পরিচিত হয়। আচার্য্য যুগে সেই "তক্মণ" রোগেরই "জ্বর" নামে নামকরণ হইয়াছিল, এ সকল কথা আমরা জ্বরেরনিদান তত্ত্বে বিস্তারিত ভাবে বলিব। "তক্মণ" যে কিরূপে জ্বর আখ্যায় পরিবর্ত্তিত হইল, তাহারও একটু আভাষ দিব।

জ্বরের পৌরাণিক ইতিহাস।

এক সময়ে প্রজাপতি দক্ষ রুদ্রকে অপমানিত করিয়াছিলেন। সেই অপমানে রুদ্রের ললাটস্থিত শশিনেত্র হইতে রক্তনাগিনীর ন্যায় বহ্নি জ্বালা বিকীর্ণ হইয়াছিল। রুদ্র রোষাগ্নি জাত বাণ প্রলয়-সহচর মহাকালের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুর গণকে সংহার এবং দেবগণকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল ধ্বংসলীলার এই উন্মাদানুষ্ঠানে — সপ্তভুবন কাঁপিয়া উঠিল। দেবগণ প্রমাদ গণিয়া প্রমথ নাথকে স্তবে তুষ্ট করিলেন। শিব শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে—নেত্রসম্ভূত ক্রোধাগ্নি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"অহং কিং করবাণি তে"

"হে দেব! আমি এখন কি করিব?"

শিব উত্তর দিলেন —

"* * * * জ্বরো লোকে ভবিষ্যসি।
জন্মাদৌ নিধনে চ ত্বমপি চাবান্তরেষু চ।"

"তুমি জীবগণের জন্মকালে, মৃত্যুকালে, এবং জন্ম মৃত্যুর মধ্যকালে, "জ্বর"রূপে অবস্থান কর।" [ক্রমশঃ]

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

আয়ুর্ব্বেদ কি Empirical?

(মাঘসংখ্যার ২২০ পৃষ্ঠার পর)

—:*:—

সংহনন—সংহনন শব্দের অর্থ শরীরের বাঁধুনী, শরীরের বাঁধুনী দেখিয়াও চিকিৎসক অনেক বিষয় অনুমান করিতে পারেন। যাহার শরীরের অস্থিগুলি সম, সুবিভক্ত, সন্ধিসকল সুবদ্ধ এবং শরীরের পেশীগুলি সুসন্নিবিষ্ট, তাহার শরীরের বেশ বাঁধুনি আছে বুঝিতে পারা যায়। যাহাদের শরীরের সংহনন আছে তাহারা প্রায়শঃ দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

সত্ত্ব—মনের বলকে সত্ব বলা হয়। শরীর

বৃহৎ ও স্থূল হইলেই মনের বল অধিক হয় না। মানুষটী দেখিতে হয়ত খর্ব্বাকৃতি শরীরও কোনমতেই স্থূল বলা যায় না অথচ মনের বল যথেষ্ট আছে, ঘোরতর মানসিক কি শারীরিক ক্লেশ অক্লেশে সহ্য করিতে পারি। কোন কোন কঠিন পীড়ায় বা কোন অঙ্গচ্ছেদ হইলেও এইসকল লোক কিছু মাত্র কাতর হয়েন না যে বৃহৎ ব্রণে শাস্ত্রোপচার কালে রোগীকে অজ্ঞান করা চিকিৎসকেরা আবশ্যক মনে করেন এই সকল লোক কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত না হইয়া সেই শাস্ত্রোপচার ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন—"ক্লোরোফরম" করার কোনই প্রয়োজন হয় না। এই শ্রেণীর লোককে "প্রবর সত্ত্ব" বলিয়া জানিবে। যাহারা অন্যের দেখা দেখি অমুক অনেক করিতেছে আমি পারিব না কেন এইরূপ সাহসে কি অন্যের সাহায্যে উপরি লিখিত "প্রবরসত্ত্ব" লোকের অনুরূপ মনের বল দেখাইতে পারে তাহারা মধ্যম সত্ত্বের লোক। আর যাহারা নিজে ত পারেই না অন্যের দেখাদেখি কিম্বা অন্যের সাহায্যেও মনের বল প্রদর্শন করিতে পারেনা, শরীর বৃহৎ ও স্থূল কিন্তু কিছুমাত্র বেদনা সহ্য করিবার শক্তি নাই, অল্পেই ভীত, অল্পেই শোকে ম্রিয়মান, সামান্য বিষয়েই অভিমানে কাতর, এমন কি উৎকট শব্দে, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে কিম্বা ভয়াবহ দৃশ্য ও শোণিত স্রাব দর্শনে অতিমাত্র ত্রস্ত, বিষণ্ণ ও বিকল চিত্ত হইয়া পড়ে তাহাদিগকে "হীন সত্ত্ব" বলিয়া জানিবে। "হীনসত্ত্ব" লোকের সামান্য শারীর কিম্বা মানস পীড়া হইলে সেই পীড়া সত্বর আরাম হয় না—আর প্রবরসত্ত্ব লোকে কঠিন-পীড়াতে ও কাতর হয় না। সত্ত্বগুণে প্রবল যন্ত্রণাকেও সামান্য বোধে অবিচলিত থাকে—সুতরাং পীড়া সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। শরীরের উপরি মনের এতই প্রভাব।

সাত্ম্য—যে আহার বিহার সতত সেবা করিলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর হয় না তাহার নাম সাত্ম্য। সাত্ম্য বস্তু শীঘ্র বলদান করে এবং বহুমাত্রায় সেবন করিলেও বিশেষ অহিত কর হয় না। এই সাত্ম্য প্রধানতঃ চারিপ্রকার জাতি-সাত্ম্য, দেশ-সাত্ম্য, ঋতু-সাত্ম্য ও ওকসাত্ম্য। যে জাতির যে বস্তু সতত ও প্রচুর ভোজনেও বিশেষ কোনও অহিত হয় না সেই বস্তু সেই জাতির জাতি-সাত্ম্য যেমন ইংরাজের পক্ষে মাংস এদেশবাসীর পক্ষে দুগ্ধ, ঘৃত, বাঙ্গালীর পক্ষে মৎস্য। চরকের চিকিৎসা স্থানের ৩০ অধ্যায়ের শেষে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও দেশবাসীর সাত্ম্য লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর প্রভাবে যে বিশেষ দ্রব্য হিতকর হইয়া থাকে তাহার নাম দেশসাত্ম্য। হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশে মধু ও মাংস হিতকর কিন্তু রাজপুতনার তুল্য মরু-প্রধান দেশে মধু ও মাংস হিতকর নহে। মান্দ্রাজ ও সিংহল বাসীর পক্ষে অতিরিক্ত লঙ্কা সেবন প্রয়োজন বটে কিন্তু উড়িষার পক্ষে অহিত কর। ঋতু বিশেষের হিতকর বস্তুকে ঋতুসাত্ম্য বলে। শীতল পানীয় বরফ প্রভৃতি নিদাঘে হিতকর হইলেও হেমন্তের পথ্য নহে। যাহা অপথ্য হইলেও কেবল অভ্যাসের গুণে পীড়াজনক হয় না তাহাকে ওকসাত্ম্য বলে। যেমন দিবানিদ্রা অহিত কর বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তির দীর্ঘকাল হইতে দিবায় নিদ্রা যাওয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে দিবানিদ্রা রোগকারী হইতে দেখা যায় না এস্থলে। দিবা-নিদ্রা ওকসাত্ম্য বলিতে হইবে। ইহা ওক-

সাত্ম্য বিহার। ওকসাত্ম্য আহারের কথা বলিতেছি। মনে করুন দীর্ঘকাল হইতে অভ্যাস করিয়া একজন মনুষ্য প্রতিদিন সিকিভরি অহিফেন সেবন করিয়া বেশ সুস্থ আছেন। অন্যের পক্ষে এতাদৃশ অহিফেন সেবন প্রাণ হাণির অথবা সংজ্ঞাহীনতা মলরোধ, উদরাধ্মান প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার কারণ হইয়া থাকে। বাস্তবিক অভ্যাসের শক্তি অতি আশ্চর্য্য। অভ্যাসের প্রভাব এতই বিস্ময়কর যে ইহার বিষয় চিন্তা করিলে নিয়ম, অনিয়ম, হিতকর, অহিতকর প্রভৃতির পার্থক্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ২ ঘণ্টা কোন পূতিগন্ধি স্থানে থাকিলে কি কিয়ৎ কালের জন্যও মলমূত্র স্পর্শ করিলে তোমার আমার শিরঃপীড়া, বিবমিষা ও অরুচি জন্মিয়া যায়। আবার ইহাও দেখিতেছি যে মেথরেরা সতত পূতি বস্তু ও মল মূত্রের সম্পর্কে থাকিয়াও কিঞ্চিৎ মাত্র ও অসুস্থতা অনুভব করে না। যে আর্দ্র, রুদ্ধ, অন্ধকার গৃহে একরাত্রি বাস করিলে তুমি আমি পীড়িত হইয়া পড়ি, কতলোক সেইরূপ গৃহে সুখে সুস্থ ভাবে বাস করিতেছে। অভ্যাসের এই বিস্ময়কর প্রভাব দর্শন করিয়া আয়ুর্বেদকার ওকসাত্ম্যকে সাত্ম্য মধ্যে গণনা করিয়াছেন। চিকিৎসক রোগীর সাত্ম্য বিবেচনা না করিয়া যদি কেবল যথাশ্রুত ভাবে চিকিৎসা করেন তাহা হইলে তিনি অপরাধী হইয়া থাকেন। চিকিৎসক রোগীর আহার-শক্তি দ্বারা পরিপাকের বল এবং ব্যায়াম-শক্তি দ্বারা কর্ম্মবল পরীক্ষা করিবেন।

বয়স—অতঃপর আমরা বয়সের কথা বলিব। বয়স প্রধানতঃ তিন প্রকার—বাল্য, মধ্য ও বৃদ্ধ। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক। বালক তিন প্রকার ক্ষীরপ, ক্ষীরান্নাদ ও অন্নাদ। একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধ পান করিয়া থাকে বলিয়া একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালককে "ক্ষীরপ" বলে। তার পর একবৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকে দুগ্ধ ও কিছু কিছু অন্ন ভোজন করে বলিয়া "অন্নাদ" বলে। যোলবৎসর হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যবয়স। এই মধ্যবয়সকাল চারি ভাগে বিভক্ত—বৃদ্ধি, যৌবন, সম্পূর্ণতা ও হানি। ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, ২০ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত যৌবন, ৩০ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা অর্থাৎ এই সময় পর্য্যন্ত ধাতু, ইন্দ্রিয় শক্তি, বল ও বীর্য্য পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪০ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত হানি—অর্থাৎ এই সময় বলবীর্য্য ঈষৎ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। ৭০ বৎসরের পর ইন্দ্রিয় শক্তি, বল, বীর্য্য উৎসাহ দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে। গাত্রের চর্ম্ম লোল হয় চুল পাকে, শ্বাস কাসাদি ব্যাধি কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া উৎসাহযোগ্য কর্ম্মে অসমর্থ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে বৃদ্ধ বলে। আজ কালকার লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বয়োবিভাগ করিতে গেলে বলিতে, হয় সুশ্রুত ৭০ বৎসরের পরে যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন অধুনা তাহা ৫০ বৎসর বা স্থলবিশেষে বলিতে গেলে বলিতে হয় তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ও দেখা গিয়া থাকে। রোগীর বয়স চিকিৎসকের একটী অবশ্য চিন্তনীয় বিষয়। রোগীর বয়সের উপরি ঔষধ নির্ব্বাচন, মাত্রা, পথ্য প্রভৃতি অনেক চিকিৎসোপযোগী তত্ত্ব নির্ভর করে। রোগীর শরীরের প্রমাণ ও চিকিৎসকের অবশ্য লক্ষ্যীতব্য বিষয়। যাহাদের দীর্ঘ আয়ু লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ চরকের বিমান স্থানের ৮ম অধ্যায়ে এবং